প্রোগ্রেস ব্যাজ

(স্কাউট প্রোগ্রাম)

PROGRESS BADGE

(Scout Programme)

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

স্কাউট প্রোগ্রাম
প্রোগ্রেস ব্যাজ

স্বত্ব ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস
বাংলাদে স্কাউটস ISBN : 984-32-1626-6
প্রোগ্রাম প্রণয়ন ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগ
প্রকাশনায় ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯৬
প্রথম সংস্কৃরণ ঃ এপ্রিল ২০০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২০০৫
তৃতীয় সংস্করণ ঃ মে ২০০৯
চতুর্থ সংস্করণ ঃ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ স্কাউটস
জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪২২২৬
ই-মেইল ঃ scouts@bangla.net
ওয়েব সাইট ঃ www.scouts.gov.bd

মুদ্রণে ঃ
দাগ
১৪২/১, আরামবাগ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০,

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুবদের সৎ চরিত্রবান, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত স্কাউট আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে একজন তরুণ-তরুণীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কাউটিংয়ের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বালক-বালিকাদের চাহিদা অনুযায়ী স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করা হয়।

বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের গোড়াপত্তন হতে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে যাঁদের হাত ধরে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন এবং বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল প্রাক্তণ সকল জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জনাব মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম খান এবং সকল জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), প্রোগ্রাম টেস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ, প্রোগ্রাম বিভাগের ডেস্ক কর্মকর্তা সহ সকলের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শাখা ভিত্তিক স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে।

আনন্দের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে স্কাউটদের জন্য নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রোগ্রামকে অধিকতর সমৃদ্ধ করা হয়েছে; যা চলমান রয়েছে। সমসাময়িক বিষয়সমূহ প্রোগ্রেস ব্যাজের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির ফলে স্কাউটদের জ্ঞান ও দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি। স্কাউটরা অতি সহজেই বিষয়সমূহ আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্কাউট প্রোগ্রেস ব্যাজ বই প্রকাশনায় জনাব এ এইচ এম শামছুল আলম সহ যাঁরা মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমার পক্ষ থেকে তাঁরে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

(মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন)
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বইসমূহে স্কাউটিং, কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিকনির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ

এইডস টু স্কাউটিং	-১৮৯৯	এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
স্কাউটিং ফর বয়েজ	-১৯০৮	স্কাউট শাখার জন্য
উলফ কাব হ্যান্ডবুক	-১৯১৬	কাব স্কাউট শাখার জন্য
এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ	-১৯২০	অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য
রোভারিং টু সাকসেস	-১৯২২	রোভার স্কাউট শাখার জন্য
গার্ল গাইডিং		গার্ল গাইড আন্দোলনের প্রসারতার জন্য
দি ব্লু বার্ড বুক		গার্ল গাইড আন্দোলনের প্রসারতার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও সময়ের বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্রপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডন পাওয়েল রচিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হত। এই স্তর ভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সূচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেন্ডার ফুট বইটিকে কচি কদম সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে দ্বিতীয় কদম এবং ফার্স্ট ক্লাস বইটিকে দৃপ্ত কদম নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের

ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী, ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি বালকদের স্কাউট শিক্ষা নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক বইটিকে কাব স্কাউট শিক্ষা নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর মুহূর্ত থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৮৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পূর্নগঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স ম মাকসুদুর রহমান রোভার পরিকল্পনা নামে বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি. ও. আর (রীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুনভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও বেশী গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপন করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ের রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) মোঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পান্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্যা ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটরা স্ব স্ব স্তরের সিলেবাস অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিম করে বয় স্কাউট নামে একটি অখণ্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখণ্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরো বেশী কার্যকরী করার জন্য স্তরিভত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক

সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস ব্যাজ	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের শেষের দিক থেকে কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহের পান্ডুলিপি প্রনেতা ও প্রকাশকাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আবদুল ওয়াহেব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদতারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবা স্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধশীল করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত রোভারিং টু সাকসেস বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউট এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরো বেশী আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তোহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজু প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্স দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এ প্রক্রিয়ায় রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোঃ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা, আলোচনা, পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক

প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তাদান করেন এবং বর্তমান সভাপতি ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান সভাপতি ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্বপালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ের প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট রোভার শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহ্বায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্স দুটিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাইদ। টাস্ক ফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। নবায়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলের অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা আরও মজবুত করেছেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	বাংলাদেশ স্কাউটস এর ইতিহাস	৯
০২	বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাংগঠনিক কাঠামো	১১
০৩	উপদল পতাকা ও ইউনিট পতাকা	১২
০৪	ধর্ম পালন	১৪
০৫	দড়ি কাজ ঃ পোল, শেয়ার ও ফিগার অব এইট ল্যাশিং	২৬
০৬	গ্যাজেট তৈরি	৩০
০৭	অনুমান	৩২
০৮	সংকেত ঃ ধোঁয়ার সংকেত	৩৭
০৯	উপস্থিত বক্তৃতা	৩৮
১০	জীবন শিক্ষা	৩৯
১১	কিমস গেম	৪১
১২	স্কাউট সেবা	৪২
১৩	প্রাথমিক প্রতিবিধান	৪৪
১৪	সঞ্চয়/ উপার্জন করা	৪৬
১৫	নিকটবর্তী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান	৪৭
১৬	মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ (ধূমপান)	৪৮
১৭	স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ	৫০
১৮	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন	৫১
১৯	পরিবেশ	৫৮
২০	প্রযুক্তি শেখা মানচিত্র	৬২
২১	কম্পিউটার	৭১
২২	গান জানা	৭৩
২৩	ট্রুপ মিটিং	৭৫

স্কাউট আদর্শ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ইতিহাস ঃ

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জন করতে গিয়ে ইতোপূর্বে তোমরা স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছ; এই বইয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ইতিহাস সম্পর্কে জানবে। ১৯১০ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের ছেলেরা তখন এই আন্দোলনে অংশ নিতে পারেনি। শুধু ইংরেজ ছেলেরা এতে অংশ নেয়। ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করে এই উপমহাদেশের ছেলেদের জন্য স্কাউটিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু একটি কল্যাণ মহৎ উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তি বিশেষের জন্য হতে পারে না অথবা একে বাধ্যবাধকতায় সীমাবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। উপমহাদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই দেশের ছেলেদের মহৎ আন্দোলন থেকে বঞ্চিত না করে সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কাউট আন্দোলনের বীজ বপন করেন। ১৯১৩ সালে ডাঃ তারাপুরওয়ালার নেতৃত্বে বেনারসে, পন্ডিত হৃদয় নাথ বাজেপয়ীর নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে, ১৯১৪ সালে মিসেস এ্যানি বেসান্ত-র পৃষ্ঠপোষকতায় কানপুরে ও শ্রীলংকায়, ১৯১৫ সালে এ, এস স্যালজলীমুনের নেতৃত্বে সিন্ধুতে, ১৯১৬ সালে ডাঃ এস এ মল্লিকের নেতৃত্বে বাংলায় এবং ঐ একই বছর এন মহাজন-এর নেতৃত্বে মুম্বাইয়ে স্কাউটিংয়ের মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়। উল্লেখ্য, তখনও এদেশের ছেলেরা স্কাউটিং করবে ব্রিটিশ সরকার তা মেনে নেয়নি এবং ব্রিটিশ স্কাউট এসোসিয়েশনও কোন স্বীকৃতি এদেশের স্কাউটিং আন্দোলনকে দেয়নি। ১৯১৭ সালে যখন এই উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে স্কাউটিং ছড়িয়ে পড়েছে তখন সরকারের কাছে আবেদন করা হয় এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আবেদন অগ্রাহ্য করে।

১৯১৮ সালে এ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে ভারত স্কাউট এসোসিয়েশন উপমহাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করে। এই এসোসিয়েশনের কার্যাবলি কিশোর যুবক তথা মানুষকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। স্কাউটিংয়ের মহৎ উদ্দেশ্য জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। ব্যাপক জনসমর্থন দেখে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালে এদেশের ছেলেদের জন্য স্কাউটিংয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

এরপর ১৯২০ সালে বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাদেশিক স্কাউট সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় কলকাতায়। এভাবেই স্কাউট আন্দোলনের শুভযাত্রা উপমাহাদেশে সূচিত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১৯২০ সালে উপমহাদেশের ছেলেরা স্কাউটিং করার অধিকার পায়। সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার পর কলকাতায় দফতর স্থাপন করে গঠিত

হয় "বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন"। এই এসোসিয়েশনের তালিকভুক্ত জেলা স্কাউট হিসেবে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) স্কাউটিং চালু ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত এই দুই নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আবার পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু'ভাগে অভিহিত হয়। সেই পূর্ব পাকিস্তানই বর্তমানে বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানে ১লা ডিসেম্বর জালাল উদ্দিন সুজার প্রচেষ্টায় করাচিতে পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। স্কাউটার এ এম সলিমুল্লাহ ফাহমীর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ২২শে মে ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়শন গঠিত হয়। এই সমিতির কার্যালয় স্থাপিত হয় ঢাকায়। এর আগে কলকাতায় বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন কার্যালয় থাকায় দেশ ভাগের পর প্রায় শূন্য হাতে কোন রেকর্ডপত্র ছাড়াই স্কাউটারদের প্রচেষ্টায় এবং প্রাদেশিক গভর্নরের তহবিল থেকে দেওয়া বছরে মাত্র এক হাজার টাকা পুঁজি সম্বল করে ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন কাজ শুরু করে।

প্রাক্তন প্রাদেশিক কমিশনার সলিমুল্লাহ ফাহমী, প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিশনার এইচ জি এস. বিভার, প্রাদেশিক সম্পাদক এ এফ এম আবদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াকিল আহম্মদ আব্বাসী এবং আরও কয়েকজন স্কাউটিং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় তদানীন্তন ইস্ট বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন একটি শক্তিশালী প্রাদেশিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে।

পরবর্তীতে ইস্ট বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন নামকরণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস, পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রাদেশিক শাখা হিসাবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত-সম্পৃক্ত ছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৮ই ও ৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রথম জাতীয় কাউন্সিল সভায় ৯ই এপ্রিল বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সালের এক অধ্যাদেশে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হন জনাব পিয়ার আলী নাজির। এই পদটি ১৯৭৮ সালে "প্রধান জাতীয় কমিশনার" নামে পরিবর্তিত হয়।

১৯৭৪ সালের পহেলা জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতিকে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সের ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালের ১৮ই জুন

পঞ্চম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ স্কাউটস", করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালের অধ্যাদেশে সমিতি শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশ স্কাউটস" নাম স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সাংগঠনিক কাঠামো

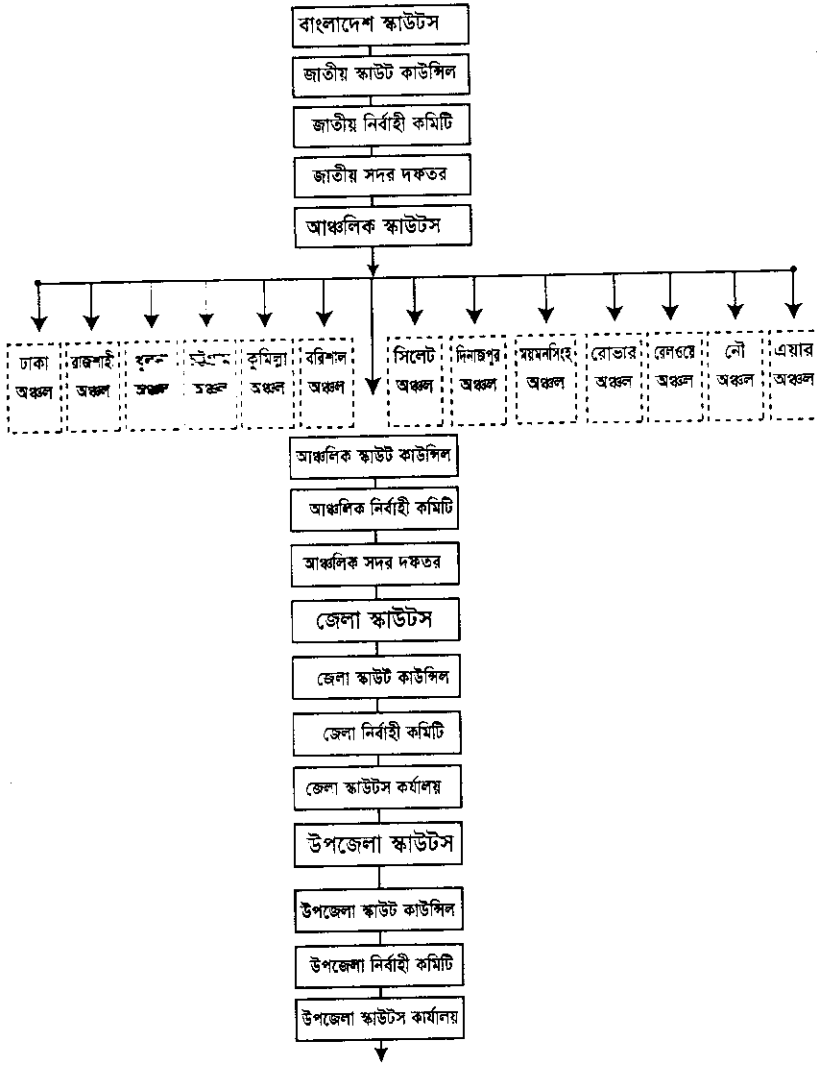

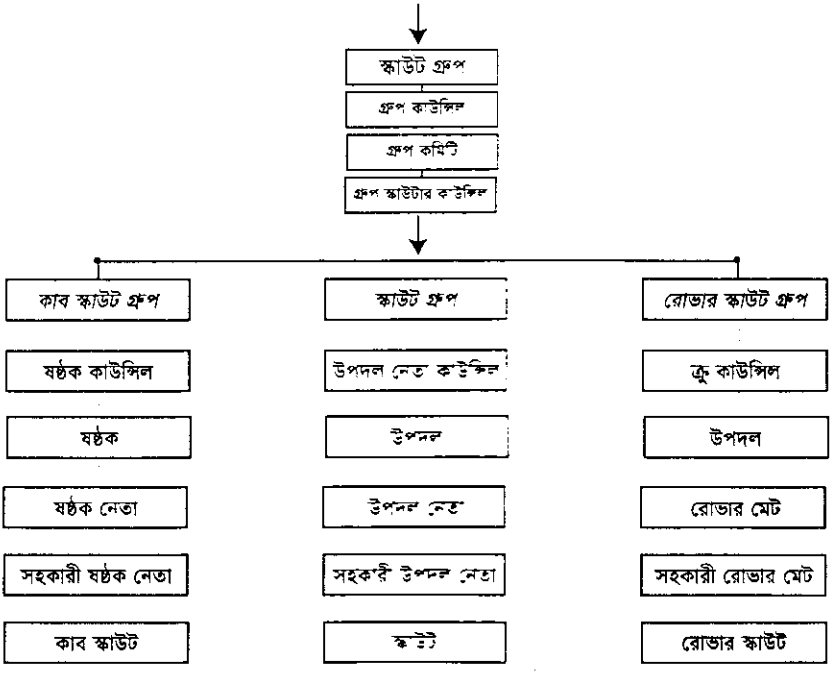

গ্রুপ ও ইউনিট পতাকা

গ্রুপ/ইউনিট পতাকা হলো প্রত্যেকটি স্কাউট ইউনিট / গ্রুপের পরিচয়বাহী পতাকা। স্কাউট পতাকার অনুরূপ হবে (গাঢ় সবুজ জমিনে আয়তাকার, দৈর্ঘ্য এক মিটার ছত্রিশ সেঃ মিঃ ও প্রস্থ নব্বই সেঃ মিঃ। পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত। মনোগ্রামের বাইরের বৃত্তের ব্যাস হবে পয়তাল্লিশ সেঃ মিঃ এবং ভেতরের ব্যাস হবে সাড়ে ত্রিশ সেঃ মিঃ। মনোগ্রামের সবুজ ত্রি-পত্র ও লাল ক্রিসেন্টের ভেতরের অংশ সাদা রংয়ের হবে। লাল ক্রিসেন্টের উভয় পার্শ্বের বৃত্তাকার সবুজ রংয়ের ০.২ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া রেখা থাকবে)। স্কাউট মনোগ্রামের নীচে সোজা লাইনে সাড়ে সাত সেঃ মিঃ মাপে গ্রুপের নম্বর সহ সংক্ষিপ্ত নাম ও উপজেলার নাম লেখা থাকবে। যেমন : ৫৪ নং খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা মেট্রোপলিটন বা ১০৪ নং হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, কিশোরগঞ্জ।

ক) রোভার স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় লাল ও লেখা সোনালী।

খ) স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় সবুজ ও লেখা সোনালী।

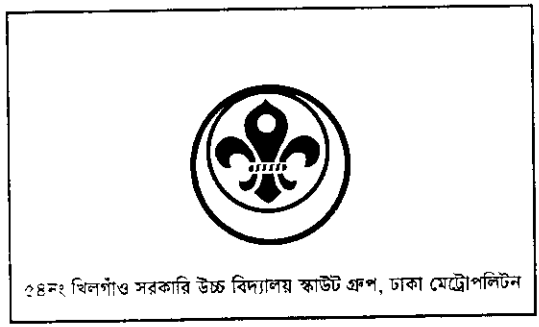

গ) কাব স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে গাঢ় হলুদ ও লেখা সবুজ।

ঘ) রেলওয়ে স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে রেলওয়ে ব্লু লেখা সোনালী রংয়ের।

ঙ) নৌ স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে নেভী ব্লু ও লেখা সোনালী রংয়ের।

চ) এয়ার স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হবে আকাশী নীল ও লেখা সোনালী রংয়ের।

উপদল পতাকা

উপদল পতাকা উপদলের পরিচয় বহন করে। এ পতাকা ত্রিকোনাকৃতি সাদা পটভূমিতে তৈরি হবে। পতাকার মাঝখানে উপদলের নামের প্রাণী অথবা পাখির মুখমন্ডল বা প্রতীক আঁকা থাকবে। উপদল পতাকার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ত্রিশ সেঃ মিঃ ও প্রস্থ বিশ সেঃ মিঃ। উপদল পতাকার দন্ডের মাপ স্কাউট লাঠির (নিজ উচ্চতার) সমান হবে।

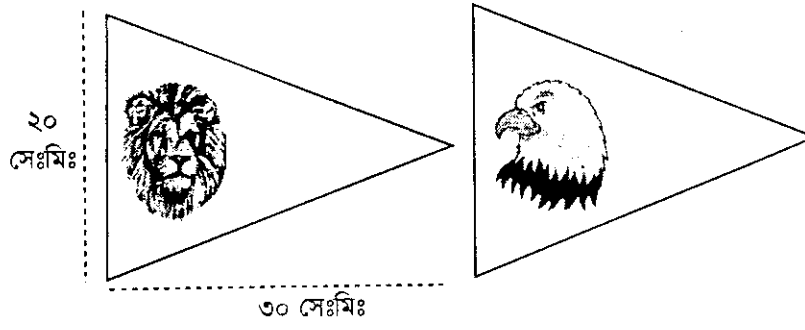

ধর্ম পালন

ইসলাম ধর্ম

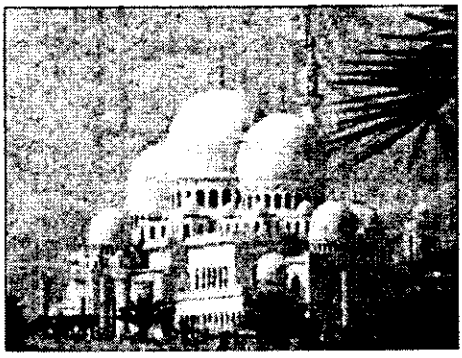

তোমরা ইতোপূর্বে সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ-এ রোজার বিবরণ সম্পর্কে জেনেছ; এছাড়াও কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ, শবে কদর, শবে মেরাজ, শবে বরাত, ফাতেহা দোয়াজ দহম, ফাতেমা ইয়াজ দহম, আশুরা সম্পর্কে জেনেছ এবং ব্যক্তিতগতভাবে চর্চা অব্যাহত রেখেছ। প্রোগ্রেস ব্যাজ স্তরে তোমরা হজ্জ, যাকাত ও কুরবানি সম্পর্কে জানবে।

মনের সিদ্ধান্তকে নিয়ত বলা হয়। নিজেকে আন্তরিকভাবে নামাজের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যেই নামাজের নিয়ত করতে হয়। তোমরা জান একত্রে কোন কাজ করলে কাজটা ভাল হয়। পরস্পরের বন্ধুত্ব বাড়ে। স্কাউটরা তাই উপদলে কাজ করে। ইসলাম বলে, তোমরা জামাতে নামাজ পড়। দিনে পাঁচ বার একই মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করলে পরস্পর কাছাকাছি আসতে বাধ্য। সপ্তাহে একদিন মসজিদে আরও বড় জামাত হয়। এটা শুক্রবারে জু'মার নামাজ।

আমরা যেমন মিলনের পরিধিকে বড় করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে র‍্যালি বা জাম্বুরী করি, ইসলামেও তেমনি বড় জামাতের জন্য ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করে। সারা বিশ্বে স্কাউটদের মেলামেশার জন্য জাম্বুরীর আয়োজন করা হয়। ইসলামও সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের একত্রিত করার ব্যবস্থা করেছে হজ্জের মাধ্যমে। মক্কা শরীফে কা'বা শরীফ অবস্থিত। কা'বা শরীফকে আল্লাহর ঘর বলা হয়।

হজ্জ ও কুরবানি ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তা'য়ালাকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, শেষ পর্যন্ত উন্নীত হলেন আল্লাহ তা'য়ালার বন্ধুরূপে। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে তাঁর মহব্বতের ওপর কয়েকবার পরীক্ষা করেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর স্ত্রীর নাম হাজেরা এবং ছেলের নাম ইসমাইল (আঃ)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে মা হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইলকে মক্কার

নির্জন পাহাড়ী এলাকায় রেখে যান। সাথে করে আনা খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেলে মা হাজেরা পানি ও সাহায্যের খোঁজে সাফা ও মারওয়া নামক দুই পাহাড়ের মধ্যভাগে ছুটাছুটি করলেন। কোথাও একটু পানি পেলেন না। ব্যর্থ হলে সন্তানের কাছে ফিরে এসে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ছোট শিশুর পায়ের আঘাত যেখানে পড়ছিল সেখান থেকে আল্লাহর আদেশে পানি বেরুচ্ছে। খানিকটা মাটি সরাতেই পেয়ে গেলেন এক কুয়া। এই কুয়ার নাম জমজম কুয়া। আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া এ পরীক্ষায় তিনি পাশ করলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর আরো একটি পরীক্ষা মোকাবেলা করেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখান যে, তিনি নিজ হাতে তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করছেন। নবীদের স্বপ্ন সত্য হয় এ জন্য তিনি ছেলেকে কুরবানী করার ইচ্ছা করেন। তাঁর মন কেঁপে উঠল। কিন্তু ছেলেই পিতাকে আল্লাহর আদেশ পালন করতে অনুরোধ করলেন। জবেহ করার জন্য তিনি ছেলেকে মিনায় নিয়ে গেলেন। পথে শয়তান ছেলেকে কুরবানি না করার জন্য প্ররোচনা দিতে চেষ্টা করল। শয়তানকে তাড়াবার জন্য তিনি তিন জায়গায় পাথর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর নিজ চোখে কাপড় বেঁধে ছেলের গলায় ছুরি চালালেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ছেলের জায়গায় একটা দুম্বা কোরবানী হয়ে গেল আর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হাসিমুখে হযরত ইসমাইল (আঃ)।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নামাজ পড়ার জন্য একটি মসজিদ তৈরি করতে বলা হলে পিতা পুত্র মিলে একটি ঘর তৈরি করলেন। তাঁরা আল্লাহর আদেশে এ ঘরের চারদিকে তওয়াফ বা পদক্ষিণ করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। এ ঘরের নাম কা'বা শরীফ।

এই সব ঘটনা স্মরণ করে প্রতি বছর জিলহজ্জ মাসের নয়, দশ ও এগার তারিখে মুসলমানগণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ায়, মিনায় যায়, শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারে, আরাফাতের মাঠে কাঁদে, কা'বা শরীফ তওয়াফ করে, নামাজ আদায় করে আর কুরবানি দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব করাকেই হজ্জ বলে।

সামর্থবানদের জিলহজ্জ মাসের দশ, এগার ও বার তারিখে কোন হালাল পশুকে কুরবানি করতে হয়। দুম্বা, ভেড়া বা ছাগল কুরবানি করলে এক জনের নামে একটি কুরবানি করা যায়। আর উট বা গরুর বেলায় সাত জনের নামে একটি কুরবানি করা যায়। জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে সকালবেলা ছয় তকবিরের সঙ্গে দু'রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করে কুরবানি দেওয়া শুরু হয়। ঐ ঈদকে কুরবানির ঈদ বা ঈদ-উল

আযহা বলে। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানগণ হজ্জ করার জন্য মক্কায় গমন করেন। মুসলমনরা ঈদ-উল আযহার দু'রাকাত নামাজ আদায় করে এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারা ঈদ-উল আযহায় কুরবানী দেয়। নিজেরা মাংস খায়, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

যাকাত ঃ সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এ শুধু মুখের কথায় নয়, কাজেও দেখাতে হয়। নিজের খাবার, সম্পদ; টাকা পয়সার অংশ ভাইকে দিতে হয়। তেমনি অপর মানুষ বা মুসলমান ভাইকেও টাকা পয়সা সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ বিলিয়ে দিয়ে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও আর্থিক সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন যাকাত দিতে। যাকাত একটি ফরজ কাজ। কি পরিমাণ অর্থ অভাবী ভাইয়ের জন্য দিতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ আল কুরআনে বলেছেন, "আল আফওয়া" অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই। তবে সর্বনিম্ন দেয় পরিমাণ ঠিক করা হয়েছে। জমাকৃত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে বায়তুল মালে বা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হয়। ঠিকমত যাকাত আদায় করলে দেশে আর অভাবী লোক থাকবে না। হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের সময় সারা মুসলিম বিশ্বে যাকাত নেওয়ার মত লোক খোঁজ করে পাওয়া যেত না।

হিন্দু ধর্ম

তোমরা ইতোপূর্বে সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ-এ ধর্মত্ত্ব, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান, ঈশ্বরবাদ, আত্মা, ঈশ্বর, ঈশ্বরের মাহাত্ম্যাসূচক স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছ এবং ব্যক্তি জীবনে তা চর্চা করছো। প্রোগ্রেস ব্যাজে পূজার্চনা ও পূজার বিধি সম্পর্কে তোমরা জানবে।

পূজার্চনা ঃ তোমরা জান ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। আমরা তাঁর স্তব-স্তুতি করি, অভিষ্ট লাভের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাই। সেসব স্তবস্তুতি শুনে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, আমাদের অভিষ্ট প্রদান করেন। এক একটি দেবতা ঈশ্বরের এক একটি শক্তির প্রতীক।

কয়েকটি সাধারণ পূজার বর্ণনা ঃ প্রতিদিন, প্রতিমাস বা প্রতিবছর বেশির ভাগ লোকই যে সব পূজা করে থাকে, সেই পূজাই সাধারণ পূজা। নারায়ণ পূজা, শিবপূজা, গনেশপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি সাধারণ পূজা।

সাধারণ পূজার বিধি ঃ পূজার আধার ঃ আধার অর্থ স্থান বা পাত্র। প্রতিমা, ঘট, পট (ফটো), মন্ডপ, শালগ্রাম, পুস্তক, শিবলিঙ্গ ও জল-এই আটটি পূজার আধার। এদের যে কোন একটিতে পূজা করা যায়।

পূজার বিধি ঃ শুদ্ধাসনে বসে পূজা করতে হয়। তারপর ক্রমশ ঃ

১। স্বস্তিবাচন
২। গন্ধপুষ্প দিয়ে নারায়ণাদির অর্চনা
৩। সূর্যার্ঘ্য
৪। সংকল্প
৫। সামান্যার্ঘ্য
৬। জলশুদ্ধি
৭। আসনশুদ্ধি
৮। করশুদ্ধি
৯। পুষ্পশুদ্ধি
১০। ভূতাপসারণ
১১। ভূতশুদ্ধি
১২। ন্যাস
১৩। প্রাণায়া
১৪। পীঠন্যাসাদি
১৫। গণেশের পূজা (পঞ্চোপচারে)
১৬। পঞ্চদেবতার পূজা (পঞ্চোপচারে)
১৭। দেবতার ধ্যান
১৮। মানস পূজাদি
১৯। পুনরায় ধ্যান
২০। আবাহন
২১। যথাসাধ্য উপচার দিয়ে পূজা সম্পাদন
২২। দক্ষিণা

২৩। বৈগুণ্য সমাধান (পূজার ত্রুটি দূরীকরণের জন্য মা প্রার্থনা)

২৪। সর্বকর্ম সমর্পণ

পূজার উপচার ঃ উপচার মানে উপকরণ। উপচার তিন প্রকার।

পঞ্চোপচার ঃ গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য

দশোপচার ঃ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার ঃ আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয় বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা।

নারায়ণ পূজা ঃ নারায়ণ পূজা প্রতীক পূজা। শাল গ্রাম শিলায় নারায়ণ পূজা করা হয়। শুদ্ধাসনে বসে আচমন করে পঞ্চদেবতার পূজা সেরে নারায়ণের ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের শেষে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে নরায়ণের পূজা করতে হয়। পূজা শেষে প্রণাম :

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

সরলার্থ ঃ নারায়ণ ব্রহ্মণ্যদেব। তিনি কৃষ্ণ, তিনি গোবিন্দ। তিনি গুরু, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতসাধন করেন। তাঁকে বার বার প্রণাম করি।

শিবপূজা ঃ শিবপূজা প্রতীক পূজা। জলে শিবপূজা করা যায়। অনেকে মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়েও পূজা করে। শিব অর্থ মঙ্গলময়। যে দেবতা ভক্তের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করেন, তিনিই শিব। আচমন থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত- শেষ করে শিবের ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের শেষে সামান্য গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ভক্তির সঙ্গে দেবতাকে অর্পন করে ভক্ত ভাবের আবেশে নিচের প্রার্থনা করে এবং প্রণাম করতে করতে আত্মসমর্পন করে।

নম ঃ

শিবায় শান্তায়
কারণ-ত্রয় হেতবে।
নিবেদামি চাত্মানং
গতিস্বত্বং পরমেশ্বর॥

অর্থঃ হে শিব, তুমি মহাদেব। তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। তুমিই আমার একমাত্র গতি। আমি তোমার চরণেই আমাকে বিলিয়ে দিচ্ছি।

গণেশ পূজা ঃ হিন্দু ব্যবসায়ীগণ প্রতিদিন পটে (ছবিতে) গণেশের পূজা করে থাকেন। ঈশ্বরের যে শক্তিতে বিঘ্ন দূর হয়, সেই শক্তির নাম হয়েছে গণেশ। গণেশ বিঘ্ননাশকারী দেবতা। ধ্যানের পর ঘোড়শোপচারে পূজা করে ভক্ত ভক্তি সহকারে প্রণাম করে ঃ

একদন্তং মহাকায়ং
লম্বোদরং গজাননম্
বিঘ্ননাশকরং দেবং
হেরম্বং প্রণমাম্যহম॥

অর্থঃ আমি বিঘ্ননাশকারী দেবতা গণেশকে প্রণাম করছি।

লক্ষ্মীপূজা ঃ প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতেই লক্ষ্মীপূজা হয়ে থাকে। মেয়েরা প্রতিদিন পটে (ছবিতে) লক্ষ্মী পূজা করে থাকে। তবে এতে আড়ম্বর নেই এবং পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। প্রতি বৃহস্পতিবার মেয়েরা ঘটে লক্ষ্মীপূজা করে। মেয়েরা নিজেরাই ফুল, বেলপাতা, ফল ও মিষ্টি দিয়ে পাঁচালি পড়ে পূজা করে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঘরে ঘরে ঘটে, পটে বা মূর্তিতে লক্ষ্মীপূজা হয়ে থাকে। লক্ষ্মী ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আচমন থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত– শেষ করে লক্ষ্মীর ধ্যান করতে হয়। আশ্বিন মাসের লক্ষ্মীপূজায় আড়ম্বর হয়। ঘরে ঘরে নাড়ু, মোয়া, ভোগ, নৈবেদ্যর প্রাচুর্য দেখা দেয়। সবকিছু লক্ষ্মীকে নিবেদন করে ব্যাকুল হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলতে হয় ঃ

নমস্তে সর্বভূতানাং
বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্বৎপ্রপন্নানাং
সা মে ভূয়াৎত্বদার্চনাং॥

সরলার্থ ঃ মা লক্ষ্মী, তুমি সকলকে ধনসম্পদ লাভের জন্য বর দিয়ে থাক। আমি তোমাকে স্মরণ করছি। আমাকেও বর দাও-আমারও যেন ধনসম্পদ লাভ হয়।

শরণাপন্ন ভক্ত গড় হয়ে প্রণাম করে বলে–

বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি
পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বত পাহি মাং নিত্যং
মহা লক্ষ্মী নমোহস্তুতে॥

সরলার্থ ঃ মা লক্ষ্মী তুমি সকলকে শুভফল প্রদান করে থাক। আমি তোমাকে প্রণাম করছি। আমাকের সব রকমে রক্ষা কর মা।

সরস্বতী পূজা ঃ প্রতি বছর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা করা হয়। ঘটে, পটে, পুস্তকে বা প্রতিমায় সরস্বতী পূজা করা যায়। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। সরস্বতী পূজায় বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ হয়। শুদ্ধাসনে বসে আচমন থেকে পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত-সেরে ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের পর নানা উপচারে দেবীর পূজা করতে হয়। পূজার শেষে সকলে মিলে শ্রদ্ধাভরে দেবীকে প্রণাম করতে হয়। প্রণাম মন্ত্রে বিদ্যার জন্য প্রার্থনা করা হয় ঃ

সরস্বতীর মহাভাবে
বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরুপে বিশালক্ষি
বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে॥

অর্থ ঃ মা সরস্বতী, তুমি বিদ্যারূপিণী। তুমি দয়া করে আমাকে বিদ্যা দাও মা।

বৌদ্ধ ধর্ম

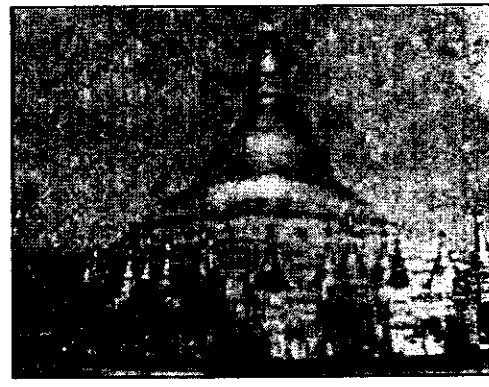

তোমরা ইতোপূর্বে সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ-এ ঈশ্বরের মহাত্মসূচক স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনা বুদ্ধ বন্দনা, ধর্মবন্দনা, সংঘ বন্দনা, কঠিন চীবর দান, প্রবরণা, উপোসথ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জেনেছ এবং তা নিজ জীবনে পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছো। এবার তোমরা প্রোগ্রেস ব্যাজে শীল, দশশীল ও প্রার্থনা শিখবে।

শীল ঃ শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। পরম করুণাময় ভগবান বুদ্ধ, জনগণের চরিত্র বিশুদ্ধির কতগুলো নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছে। সেই নিয়মসমূহ শীল নামে অভিহিত। যাঁরা এ শীল পালন করেন তাঁদের শীলবান বলা হয়।

শীল পালনের অশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। শীলবান ব্যক্তি ধনের অধিকারী হন। চতুর্দিকে শীলবান ব্যক্তির যশ ঘোষিত হয়। শীলবান ব্যক্তি যে কোন সভায় নিঃসঙ্কোচে গমন করেন।

নিঃসঙ্কোচে গমন করেন। শীলবান ব্যক্তি সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন; মৃত্যুকালে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন না। শীল পালনের অশেষ গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। সুতরাং শীল পালনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য।

"পঞ্চশীল প্রার্থনা"

ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণের সহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি; অনুগগহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযাম্পি অতিযাম্পি মে ভন্তে।

অনুবাদ ঃ ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার.....তৃতীয় বারও.....শীল প্রদান করুন।

"ত্রিশরণ"

বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি - আমি বুদ্ধের সরণ গ্রহণ করছি।

ধম্মং সরনং গচ্ছামি - আমি ধর্মের সরণ গ্রহণ করছি।

সংঘং সরনং গচ্ছামি - আমি সংঘের সরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বারও.....সরণ গ্রহণ করছি।

"পঞ্চশীল"

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

২। অদিন্নদানা বেরকণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিকখাপদং সামাদিযামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৫। সুরামেরেষ মজ্জপমাদটঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

অনুবাদ ঃ

১। প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২। অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩। মিথ্যা কামাচার থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪। মিথ্যা বাক্য কথন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫। সুরামৈরেয় মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতি প্রমত্ততার কারণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

"অষ্টশীল প্রার্থনা"

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ আট্ঠসমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্বং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযাম্পি.....ততিযাম্পি.....মে ভন্তে।

অনুবাদ ঃ ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্ঠাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচ্ঞা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার..... তৃতীয়বার.....আমাকে শীল প্রদান করুন।

"অষ্টশীল"

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।
২। অদিন্নদানা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।
৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।
৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।
৫। মুরামেয়েয মজ্জপমাদটঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।
৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।
৭। নাচ-গীত বাদিত বিসূকদসস্ন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মন্ডন-বিভুসনাট্ ঠানা
৮। উচচসযনা মহাসসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সসমাদিযামি।
বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

অনুবাদ ঃ

১। প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২। অদত্তবস্ত গ্রহণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩। অব্রহ্মচর্য থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪। মিথ্যা কথন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫। সুরামৈরেয় মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতি প্রমত্ততার কারণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬। বিকাল ভোজন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭। নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব দর্শন, মালা, গন্ধ বিলেপন ধারণ মন্ডন বিভূষণ কারণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮। উচচাসন মহাসয্যায় শয়ন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

"দশশীল প্রার্থনা"

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সঙ্গিং পব্বজ্জ সামণের দসসীলং ধম্বং যাচামি অনুগগহং কত্বা সীলং দেখথ যে ভন্তে দুতযম্পি..... ততিযম্পি..... মে ভন্তে।

অনুবাদ ঃ ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ শ্রাবণের প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাঞ্চা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বারও.....আমাকে শীল পদ্রনা করুন।

"দশশীল"

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

২। অদিন্নাদান্ন বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৩। অব্রহ্মচারিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৫। সুরামেরেয মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৭। নাচ্চ-গীত-বাদিত বিসুকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৮। মালাগন্ধ-বিলেপন-ধরণ-মন্ডন-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

৯। উচ্চসয়না-মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

১০। জাতরূপ রজতপটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং সামাদিযামি।

দুতিযম্পি..... ততিযম্পি..... সমাদিযানি।

অনুবাদ ঃ

১। প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২। অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩। অব্রহ্মচর্য থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪। মিথ্যা কথন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫। সুরামৈরেয় মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতি প্রমত্ততার কারণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬। বিকাল ভোজন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭। নৃত্য-গীত-বাদ্য উৎসব দর্শন, মালা, গন্ধ বিলেপন ধারণ মন্ডন বিভূষণ কারণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮। উচচাসন মহাসয্যায় শয়ন থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৯। স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ থেকে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি এই প্রব্রজ্যা শ্রামণের দশ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার..... তৃতীয়বারও..... গ্রহণ করছি।

খ্রিষ্ট ধর্ম

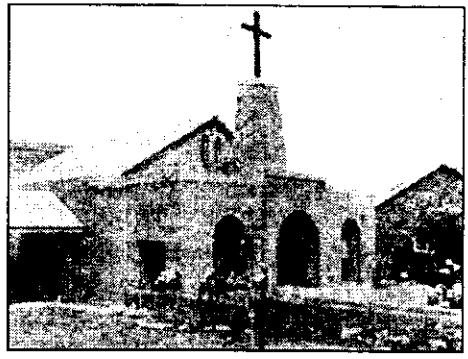

তোমরা ইতোপূর্বে সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ-এ খ্রিষ্ট ধর্ম, খ্রিষ্টের অনুসারী হওয়ার গুণাবলী, প্রার্থনা ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের ভালোবাসার উপলব্ধি, জীবন সাক্ষ্য, পবিত্র বাইবেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বাইবেল পাঠের উদ্দেশ্যে মন্ডলীর শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছ প্রোগ্রেস ব্যাজে তোমরা মুক্তির ইতিহাস, ঈশ্বরের আওতাসমূহ, মন্ডলীর পার্বণসমূহ সম্পর্কে জানবে।

(১) মুক্তির ইতিহাস ঃ ঈশ্বর তাঁর সুমহান পরিকল্পনায় মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে যে অনুগ্রহ ও আশির্বাদ প্রদর্শন করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বস্তরের মানুষের জানা আবশ্যক। প্রথমত ঃ আদি পিতা-মাতার পাপের ফলে পাপী মানুষ জগতে নির্বাসিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর দয়াতে মহান ও ক্রোধে ধীর বিধায় তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্য।

তিনি তাঁর মনোনীত জাতি হিসেবে বেছে নিলেন ইস্রায়েল জাতিকে। ইতিহাসের বাস্তবতায় পাপস্বভাব ও দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে তিনি ইস্রায়েল জাতির নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে পূর্ণ করলেন।

বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম থেকে শুরু করে পরবর্তীতে মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে ৪০ বছর ধরে যাত্রা করে প্রতিশ্রুত কানান দেশে পৌছেছিল। যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর তাঁর সেবক বিভিন্ন ভাববাদীদের প্রেরণ করে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে পরিত্রানের পূণ্য আশা জাগিয়ে রেখেছেন এবং হতাশা ও অন্ধকারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন।

(২) ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা ঃ সমস্ত জীবজন্তু ও পশুপাখীদের মধ্যে বিবেকবান ও বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু ছিল না। তাই ঈশ্বর অসীম ভালবাসা দিয়ে তাঁর আপন সাদৃশ্যে এবং নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেই মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করল। কিন্তু মঙ্গলময় ও মহান ঈশ্বর তাকে ধ্বংস না করে বরং তার মুক্তির জন্য সুন্দর একটি পরিকল্পনা নিলেন। মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের সাথে তিনি একটি সন্ধি স্থাপন করলেন এবং তাদেরকে পাপবন্ধন থেকে

মুক্ত করার জন্য আপন পুত্রকে এ জগতে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। যুগ যুগ ধরে মুক্তির সেই ইতিহাসের ধারায় মানুষের প্রতি ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। অবশেষে কালের পূর্ণতায় তিনি তাঁর আপন পুত্রকে পাঠিয়েছেন মানবজাতির ত্রাণ কর্তারূপে। ঈশ্বরের চিরন্তন বাণী দেহধারন করে মানুষের মাঝে জন্ম নিলেন, যার নাম যিশুখ্রিষ্ট। তিনি আপন মৃত্যু পুনরুত্থান দ্বারা মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনিই মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরিচয় প্রকাশ করেছেন এবং তাঁকে পিতা বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। যিশুতে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের বাণী পাঠ ও ধ্যান করে, প্রতিবেশী ভাইবোনদের ভালবেসে মানুষ যিশুর সাথে একাত্ম হতে পারে এবং তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান সকল মানুষকেই ভাইবোন বলে বুঝতে ও চিনতে পারে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হচ্ছে যিশুর মধ্য দিয়ে গোটা মানবজাতিকে তাঁর নিজের কাছে টেনে নেওয়া, সবাইকে পাপের দাসত্ব হতে মুক্ত করে স্বর্গীয় সুখ দান করা।

(৩) ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ ঃ সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে প্রতিটি মানুষকে কোন কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন বা বিধি বিধান পালন করতে হয়। মানুষের অন্তরে লিখে দেওয়া স্রষ্টার আদেশ-নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইস্রায়েল জাতি দীর্ঘদিন নির্বাসিত থাকার পর দাসত্ব হতে মোশীর নেতৃত্বে মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ ও আজ্ঞাসমূহ পালনে সক্ষম হয়। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মনোনীত হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা প্রদানের জন্য এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকার জন্য মোশীকে যে আইন ফলক প্রদান করেন সেগুলোকে আমরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা হিসাবে জানি। এই আজ্ঞাসমূহ মেনে চলা এবং সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে এগুলো অনুশীলন করাই হচ্ছে আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

(৪) পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ঃ তোমরা যদি আমাকে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। আর আমিও পিতার কাছে আবদেন জানাব। তিনি তখন আর একজন সহায়ককে তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি দেবেন সেই সত্যময় আত্মাকে, সংসার যাকে গ্রহণ করতে পারে না, যেহেতু সংসার তাকে দেখতেও পায় না, জানতেও পারে না। তোমরা অবশ্য তাঁকে জান, তিনি তো সর্বদাই তোমাদের পাশে আছেন, অন্তরেও থাকবেন। তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি তোমাদের এসব কথা বললাম। কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি

তোমাদের সব কিছুই শিখিয়ে দেবেন এবং যা-কিছু আমি তোমাদের বলে গেলাম, সেই সমস্তই তিনি তোমাদের মনে করিয়েও দেবেন (যোহন ১৪ঃ ১৫-১৭-১৭, ২৫-২৬)।

(৫) মন্ডলীর পার্বণসমূহ ঃ মন্ডলী সজীবতা ও সক্রিয়তা প্রকাশ পায় ভক্তগণের অংশগ্রহণ ও বাস্তব জীবনের অনুশীলনের দ্বারা। মন্ডলীতে বিশেষ দুটো পর্ব আছে যেমন, প্রভু যিশুর জন্ম বা বড়দিন এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান (ইস্টার)। এ পর্ব দুটোর তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য আরও বিশেষ কয়েকটি পর্বোৎসব রয়েছে যা উদযাপন করা আবশ্যক। যেমন, যিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর ভিত্তি করে কয়েকটি পার্বন এবং সাধুসাধ্বীদের স্মৃতিচারণসহ তাদের জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে পার্বন। এগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে মান্ডলিক বোধ ও ঐক্য গড়ে ওঠে। এই সব পার্বণ পালন করে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করার নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা পাই। অপরদিকে এসবের অন্তর্নিহিত শিক্ষা আমাদের বিশ্বাস ও জীবনকে সুদৃঢ় করে তোলে।

স্কাউট দক্ষতা

দড়ির কাজ ঃ

পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLE & SHEAR LASHING)

দুটি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে বেঁধে তাকে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। যখন দু'টি বাশ বা দণ্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে শিয়ার লেগ বলে এবং যখন একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে একত্রে বেঁধে তাকে লম্বা করা হয় তখন তাকে পোল বলে। মূলতঃ শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিয়ার লেগ তৈরির জন্য ফ্র্যাপিং (FRAPPING) দিতে হয় এবং পোল তৈরির জন্য ফ্র্যাপিং দিতে হয় না।

পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিয়ের (POLE & SHEAR LASHING) সাহায্যে কিভাবে শিয়ার লেগ পোল তৈরি করা হয় নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হল।

শিয়ার লেগ তৈরি (SHEAR LEG MAKING) ঃ

দু'টি বাঁশ বা দন্ডের নীচের অংশ সমান্তরাল রেখায় রেখে দু'টি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে উপরের যে কোন একটি বাঁশ বা দন্ডে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বাঁধতে হবে। ক্লোভ হিচ বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি

অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দু'টি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নীচে থেকে উপরে চলে যাও। লক্ষ্য রাখবে দুই বাঁশ দন্ডের সাথে প্যাঁচানোর সময় একটি দড়ি যেন অপর দড়ির সাথে লেগে থাকে, একটি দড়ি যেন অপর একটি দড়ির উপরে উঠে না যায় এবং সেখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে। আট-দশবার প্যাঁচান শেষ হলে দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে ৩-৪ বার পেঁচিয়ে দাও। দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানকে ফ্র্যাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্র্যাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে। ফ্র্যাপিং দেয়া শেষ হলে প্রথমে যে বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভ হিচ দিয়ে ল্যাশিং শুরু করেছিলে তার বিপরীত বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শেষ কর। এভাবে শিয়ার লেগ তৈরি করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLL & SHEAR LASHING) বাঁধতে হয়।

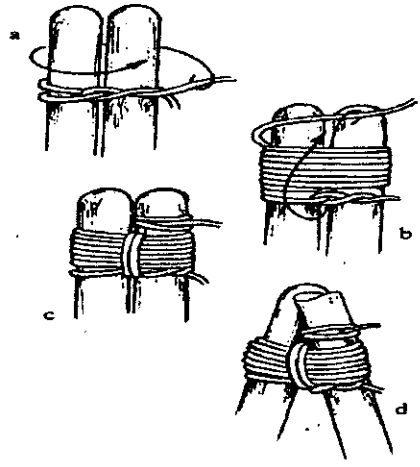

অনেকে এই ল্যাশিংকে কেবলমাত্র শিয়ার ল্যাশিং বলে।

নিচের সহায়ক লিংকটির মাধ্যমে তোমরা অনলাইনেও এই ল্যাশিংটি শিখতে পারবে।

http://www.animatedknots.com/lashashear

পোল তৈরি (POLE MAKING) ঃ

একটি বাঁশ বা দন্ডের মাথার ২০ সেঃ মিঃ নীচে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের নীচের অংশ রেখে বাঁশ বা দণ্ডকে আগের বাঁশ বা দন্ডের পাশাপাশি রাখ। এবার নীচে রাখা বাঁশ বা দণ্ডটি যেখানে উপরের বাঁশ বা দন্ডের সাথে মিলিত হয়েছে তার ৪-৫ সেঃ মিঃ উপরে দু'টি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্রিত করে সেখানে দড়ির স্থির অংশ দিয়ে একটি ক্লোভ হিচ বাঁধ। ক্লোভ হিচ বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। এরপর দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দুই বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে নীচ থেকে উপরের দিকে পেঁচিয়ে যাও। ৮-১০ বার প্যাঁচান হয়ে গেলে বাঁধ বা দণ্ডকে একত্র করে ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ কর।

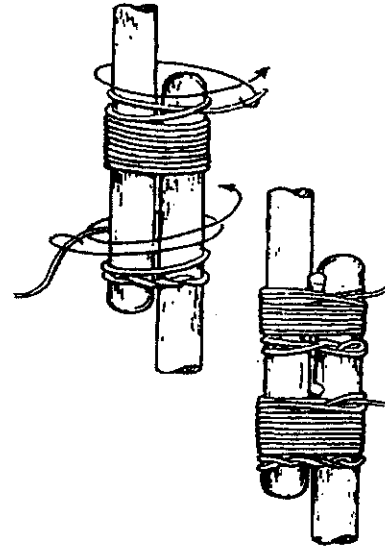

এরপর নীচের বাঁশ বা দণ্ডটি উপরের বাঁশ বা দন্ডের সাথে যেখানে মিলিত হয়েছে এবং যেখানে নীচের বাঁশ বা দণ্ড শেষ হয়েছে তার ৪-৫ সেঃ মিঃ নীচ থেকে দুই বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে দড়ির এক প্রান্ত দিয়ে সেখানে একটি ক্লোভ হিচ বাঁধ। দড়ির যে প্রান্ত দিয়ে ক্লোভ হি বেঁধেছে সেটি হচ্ছে দড়ির স্থির প্রান্ত। ক্লোভ হিচ বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। এরপর দড়ির চলমান অংশ দিয়ে আগের মত দুই বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে উপর থেকে নীচে পেঁচিয়ে যাও। ৮-১০ বার পেঁচান হয়ে গেলে দুই বাঁশ বা দণ্ডকে একত্র করে ক্লোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শেষ কর।

দুটি বাঁশ বা দণ্ড যেখানে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে সেখানে আলাদা আলদা ল্যাশিং বাঁধন অত্যন্ত শক্ত হয় এবং বাঁশ বা দন্ড কোন দিকে হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এভাবে পোল তৈরি করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLL & SHEAR LASHING) বাঁধতে হয়। এক বা একাধিক বাঁশ বা দণ্ডকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLL & SHEAR LASHING) ব্যবহার করা হয়। অনেকে এই ল্যাশিংকে পোল ল্যাশিং বলে।

ফিগার অব এইট ল্যাশিং (FIGURE OF EIGHT LASHING) ঃ

তিনটি বাঁশ বা দন্ডের নীচের অংশকে একই সমান্তরাল রেখায় রেখে বাঁশ বা দণ্ড তিনটিকে একটির পাশে অপরটি রাখ। বাঁশ বা দণ্ড তিনটি খুব কাছাকাছি থাকবে। এবার বাঁশ বা দণ্ড তিনটির মধ্যে দু'পাশের যে কোন একটি বাঁশ বা দন্ডের (মাঝখানের বাঁশ বা দণ্ড বাদে) উপরের অংশে তোমার সুবিধা মতো জায়গায় দড়ির স্থির অংশ দিয়ে একটি ক্লোভ হিচ বাঁধ। ক্লোভ হিচ বাধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। এবার দড়ির চলমান অংশকে একটি বাঁশ বা দন্ডকে বাদ দিয়ে পরবর্তী বাঁশ বা দণ্ডকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নীচ থেকে উপরের দিকে চলে যাও। অন্ততঃপক্ষে ৫-৭ বার প্যাঁচান শেষ হলে যে বাঁশ বা দন্ডের সাথে প্রথম ক্লোভ হিচ বেঁধেছিলে সেই বাঁশ বা দন্ডের পার্শ্ববর্তী বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে সে দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে অন্ততঃপক্ষে প্রথমে তিনবার প্যাঁচ দাও এবং পরবর্তীতে পাশের দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে আবার আগের মত করে অন্ততঃপক্ষে ৩-৪ বার ফ্রাপিং দাও। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে প্রথমে যে বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শুরু করেছিলে তার পরবর্তীটি বাদ দিয়ে তৃতীয় বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে ফিগার অব এইট ল্যাশিং (FIGURE OF EIGHT LASHING) বাঁধতে হয়।

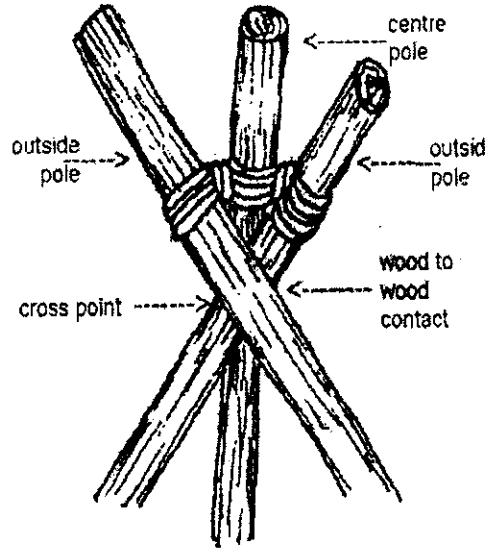

তিনটি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্রে বেঁধে ট্রাইপট তৈরী করার জন্য ফিগার অব এইট ল্যাশিং (FIGURE OF EIGHT LASHING) ব্যবহার করা হয়।

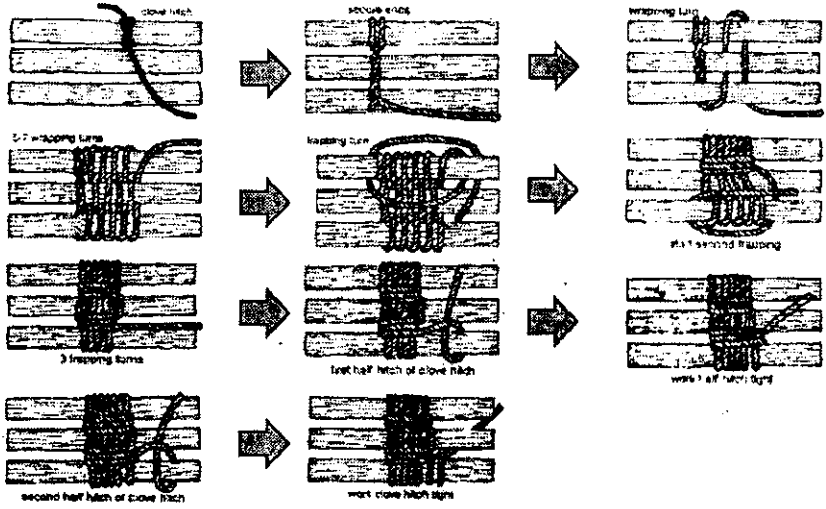

গ্যাজেট (GADGET) তৈরি ঃ

তোমরা দরকারী গেরো ও ল্যাশিং বাঁধতে শিখেছ। এবার এ ব্যবহার করতে হবে। সঠিক ল্যাশিং ও গেরো দিয়ে গ্যাজেট বা প্রজেক্টের মডেল তৈরি শিখতে হবে এবং হাতে কলমে তা করতে হবে। তাঁবুতে বসবাসের জন্য গাছের ডাল, বাঁশ বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে তৈরি সাময়িক আসবাবপত্রকে গ্যাজেট বলে।

নিম্নে কয়েকটি গ্যাজেটের নমুনা দেওয়া হল ঃ

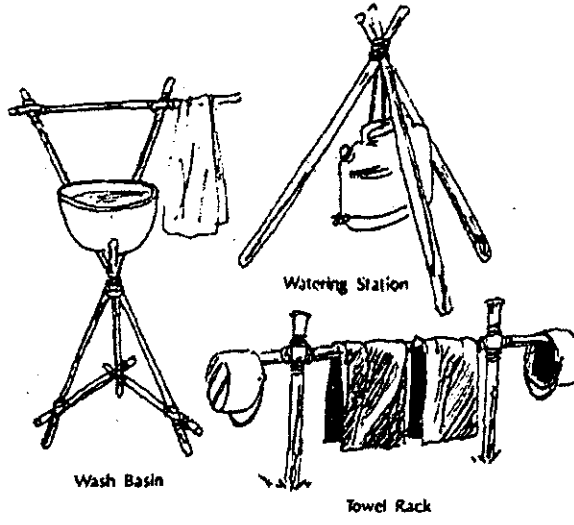

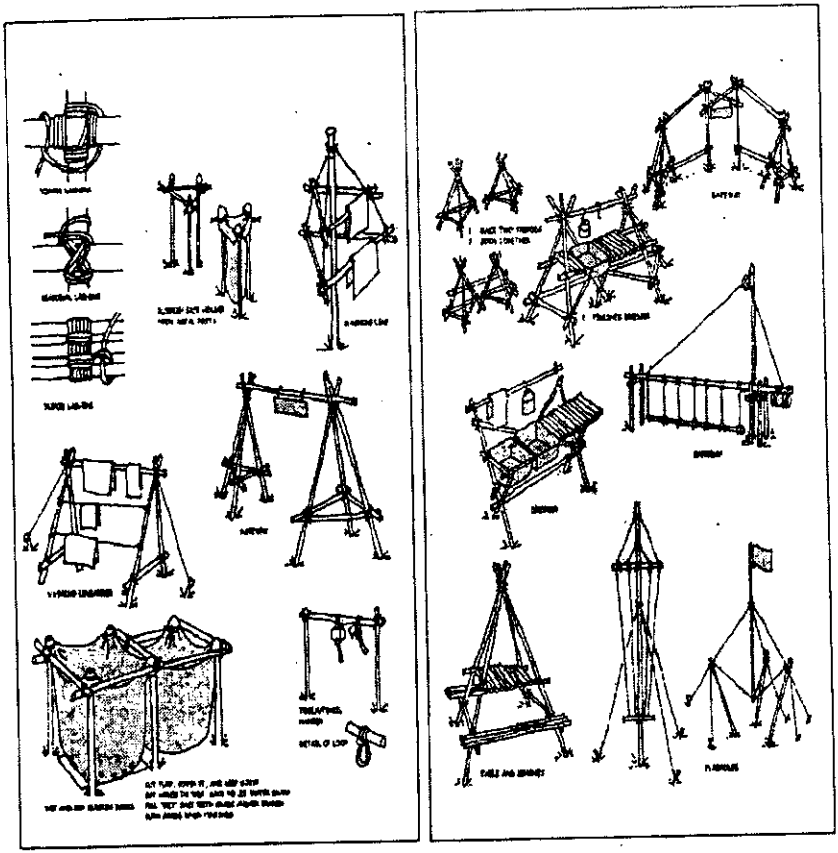

তাঁবুবাসের সময় তুমি ও ইউনিটের স্কাউটেরা অনেক মালপত্র নিয়ে যাও। সে সব মালপত্র রাখার জন্য দরকারী আসবাবপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর সব কিছু নিয়ে গিয়ে তাঁবুবাস করা হয় না।

তাঁবু জীবনে তোমাদের মালপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য গ্যাজেট তৈরি করতে হয়। বাঁশ, গাছের ডাল ও দড়ি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে এসব গ্যাজেট তৈরি করা হয়। গ্যাজেটের নমুনাগুলো দেখ। গ্যাজেটগুলো দেখার উদ্দেশ্য হল যেসব গেরো ও ল্যাশিং শিখেছ সেগুলো দৈনন্দিন কাজকর্মে লাগানো। ঘরের খুঁটি, রয়া ইত্যাদি ঠিকঠাক মত বাঁধতে হলে এসব গেরো জরুরী। দরকার মত এসব গেরো ছাড়াও নিজেরা আপন আপন গেরো লাগাতে চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, যে গেরো তুমি নিজে খুলতে পারবে না, সে গেরো দেওয়া ঠিক নয়।

অনুমান (ESTIMATION)

কোন বস্তুকে সরাসরি না মেপে অনুমান করে বস্তুর উচ্চতা, দূরত্ব, ওজন ও গভীরতা নির্ণয় করার কৌশলকে অনুমান বলে।

দূরত্ব মাপা

তোমরা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জন করতে গিয়ে অনুমান করার জন্য জ্যামিতিক পদ্ধতি, ইঞ্চি থেকে ফুট পদ্ধতি, ছায়া পদ্ধতি সম্পর্কে শিখেছ। এখানে দূরত্ব ও উচ্চতা মাপার জন্য আরও কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হল।

থাম্ব মেথড (Thumb Method) ঃ ক থেকে খ এর দূরত্ব বের করতে হবে। ক-এ দাঁড়াও এবং ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে মুষ্ঠিবদ্ধ কর। এরপর বুড়ো আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে সামনের দিকে রেখে খ-এর দিকে সোজা করে ধর এবং খ-এর জায়গায় একটা গাছ বা কোন লক্ষ্যবস্তুকে ঠিক করে নাও।

ডান চোখ বন্ধ করে খোলা চোখ বুড়ো আঙ্গুলের উপর দিয়ে "খ" এর বা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নজর কর। এবার বন্ধ চোখ খুলে অপর চোখ বন্ধ করে পুনরায় লক্ষ্য কর। দেখবে লক্ষ্যবস্তুটি আঙ্গুলটির একদিকে সরে গিয়েছে বলে মনে হবে। এই ফাঁকা জায়গাটির দূরত্ব ২০ মিটার মনে হয়। এখন ২০ কে ৯ দিয়ে গুণ করলে ক থেকে খ এর দূরত্ব ১৮০ মিটার হবে। সব সময় ফাঁকা জায়গার দূরত্বকে ৯ দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাবে কয়েকটি জায়গা অনুমান করে মেপে ঠিক মত আবার মেপে দেখ। বার বার অনুশীলনে তোমার অনুমান সঠিকের কাছাকাছি হবে।

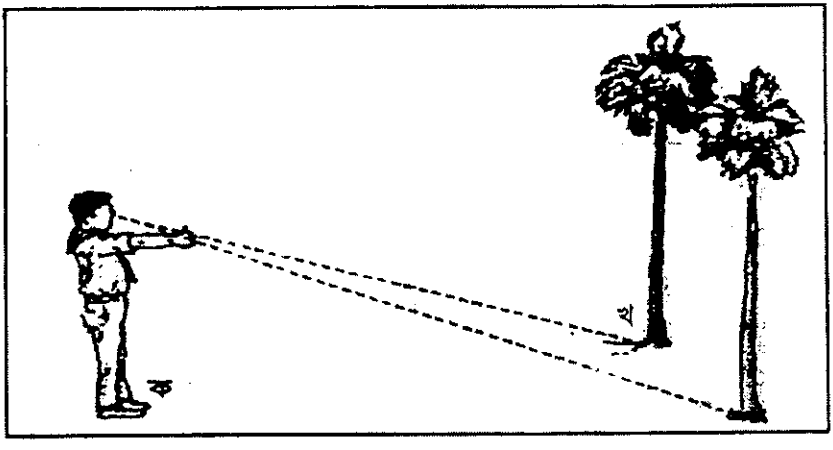

জার্মান পদ্ধতি (German Method) ঃ দূরত্ব বের করার জন্য জার্মান সৈন্যদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তা নিচে দেওয়া হল। এ দিয়েও দূরত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

সাধারণত, একটি লোককে,
২০০ গজ দূরে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।
৩০০ গজ দূরে মুখের চেহারা অনুমান করা যায়, পরিষ্কার দেখা যায় না।
৪০০ গজ দূরে পদচারণা দেখা যায়, চেহারা অনুমান করা শক্ত।
৫০০ গজ দূরে মাথা বা মাথার টুপি দেখা যায়, চেহারা দেখা যায় না।
৬০০ গজ দূরে মাথা একটা বিন্দুর মত মানে হয়, টুপি বোঝা যায় না।
৭০০ গজ দূরে মাথা দেখতে কষ্ট হয়।
৮০০ গজ দূরে মাথা দেখা যায় না, লোকটিকে গাছের গোড়ার মত দেখা যায়।
১০০০ গজ দূরে হাত পায়ের নড়াচড়া দেখা যায়।

পূর্বে গজের মাপে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। এখন মিটার পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ফল প্রায় একই থাকবে।

স্কাউট কদম পদ্ধতি (Scout Step Method) ঃ

স্কাউট কদমের সাহায্যেও দুরত্ব নির্ণয় করা যায়। স্কাউট কদমে ঘন্টায় প্রায় ৭ কিঃ মিঃ হাঁটা যায়। ঘড়ি দেখে স্কাউট কদমে (রীতিমত অভ্যাসের পরে) হাঁটলে দূরত্ব ঠিক করা যায়। ১২০ স্কাউট কদমে ১০০ গজ হয়।

উচ্চতা মাপা

এখানে উচ্চতা মাপার জন্য তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হলো–

রেড ইন্ডিয়ান পদ্ধতি (Red Indian Method) ঃ

যে লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা মাপতে হবে তা থেকে সুবিধামত একটু দূরে গিয়ে লক্ষবস্তুটিকে পিছনে করে দাঁড়াও। এবার পা ফাঁকা করে সামনের দিকে শরীর ঝাঁকিয়ে

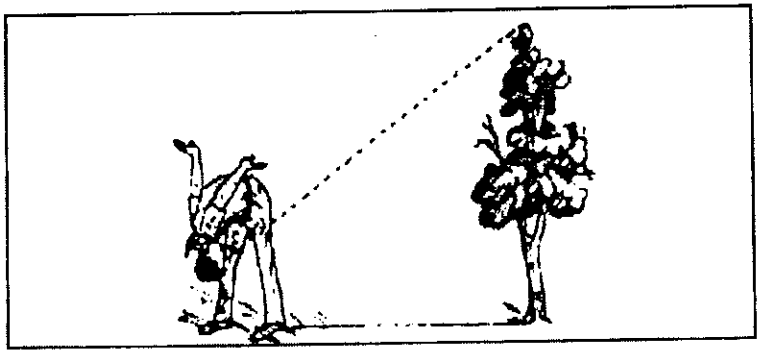

বাঁকিয়ে দু পায়ের ফাঁক দিয়ে যত উপরের দিকে পার দেখতে চেষ্টা কর। দরকার মত সামনে পিছনে করে পায়ের ফাঁক দিয়ে যত উপরের দিকে পার দেখতে চেষ্টা কর। পায়ের ফাঁক দিয়ে যখন লক্ষ্যবস্তুটির মাথা দেখা যাবে সেখানে দাঁড়াও। ঐ জায়গা থেকে লক্ষবস্তুটির দূরত্ব লক্ষ্যবস্তুটির উচ্চতার সমান হবে।

ত্রিকোণী বা ট্রাংগুলার পদ্ধতি (Triangular Method) ঃ

গাছের গোড়া থেকে তোমার সুবিধামত কিছু দূরে যাও এবং তোমার লাঠিটি খাড়াভাবে পুঁতে রাখ। মনে কর ২৮ ফুট গিয়েছ। একই দিকে আরও একটু যাও।

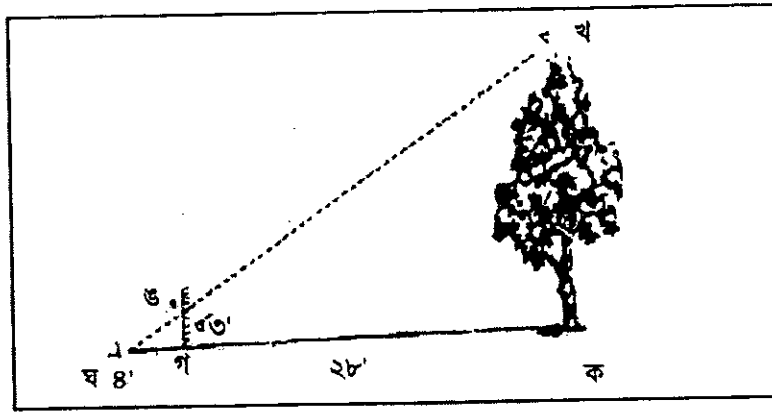

মনে কর আরও ৪ ফুট গিয়েছ। এবার মাটিতে শুয়ে দেখ গাছের মাথার লাইন তোমার লাঠির কোন জায়গা ছোঁয়া। ছোঁয়া জায়গা থেকে মাটি পর্যন্ত মনে কর ৩ ফুট হয়েছে। এখন মনে কর, গাছের গোড়া "ক" গাছের মাথা "খ", লাঠির গোড়া "গ" এবং তুমি যেখানে শুয়েছ সেটা "ঘ" এবং লাঠির যে জায়গায় লাইন হয়েছে সেটা "ঙ"।

এখন ক থেকে গ ২৮ ফুট এবং গ থেকে ঘ ৪ ফুট।

তাহলে, ক থেকে ঘ ২৮+৪= ৩২ ফুট। গ থেকে ঙ ৩ ফুট সমানুপাতের সূত্র অনুসারে

ক খ ঃ ক ঘ = গ ঙ ঃ গ ঘ

অর্থাৎ ক খ ঃ ৩২ = ৩ ঃ ৪

$$\frac{\text{কখ}}{৩২} = \frac{৩}{৪}$$

$$\text{বা, ক খ} = \frac{৩২ \times ৩}{৪}$$

ক খ = ২৪ ফুট

এভাবে তুমি যে কোন জিনিসের উচ্চতা মাপতে পার।

টি–পদ্ধতি (T- Method) ঃ

দুটি সমান দৈর্ঘ্যের কাঠির সাহায্যে (T) তৈরী করে এর দ্বারা উচ্চতা মাপা যায়। যন্ত্রপাতি - 15 cm এর বেশি নয় এরূপ দৈর্ঘ্যের দুটি সমান কাঠির সাহায্যে তৈরী একটি T। T এর দুটি অংশের নাম ধরা যাক DE and FG।

কাজের ধারা ঃ মনে করি গাছ AB এর উচ্চতা মাপতে হবে। এই পরিমাপের জন্য কাজের ধারা নিম্নরূপ ঃ

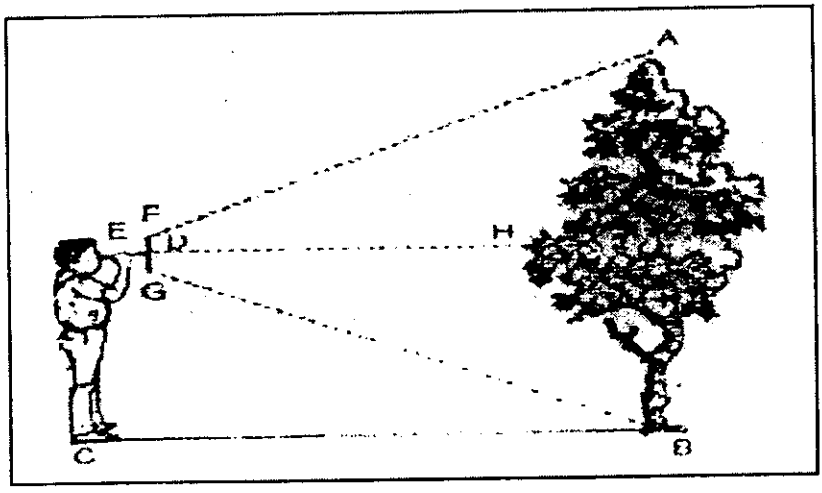

১. চোখের আন্দাজে গাছের উচ্চতা সমান আনুমানিক দূরত্বে পরিমাপকারীকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

২. T টির অংশ DE ধরে E বিন্দুকে নাকের যেকোন পাশে চোখের কোণায় স্থাপন করতে হবে।

৩. নাকের যে পাশে T ধরা হয়েছে সেই চোখ খোলা রেখে অন্য চোখ বন্ধ করে সামনে তাকাতে হবে।

৪. পরিমাপকারীকে আগে পিছে সরে এমন অবস্থানে দাঁড়াতে হবে যেন F বিন্দুর সঙ্গে A বিন্দু এবং G বিন্দুর সঙ্গে B বিন্দু মিলে যায়। ধরা যাক দাঁড়ানো অবস্থানটি C।

৫. BC দুরত্ব মাপতে হবে এবং এই দূরত্বই হবে গাছের উচ্চতার সমান।

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা ঃ

$\triangle$ ABE and FGE $\triangle$ প্রায় সদৃশকোণী

$$\frac{AB}{FG} = \frac{HE}{DE}$$

$$AB = \frac{FG}{DE} \times HE \text{ [যেহেতু FG = DE]}$$

$$= HE$$

$$= BC$$

মন্তব্য ঃ $\triangle$ ABE and $\triangle$ FGE পুরোপুরি সদৃশ্য নয় বলে এই অনুমানে সঠিক মাপের সামান্য তারতম্য হতে পারে।

ওজন

প্রথমে বিভিন্ন ওজনের পাথর এক কেজি, দুই কেজি, পাঁচ কেজি ইত্যাদি জোগাড় করে হাতে নিয়ে ওজন বুঝতে অভ্যাস কর। পরে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চাল, আলু, ডাল, আটা, পেঁয়াজ ইত্যাদি ভরা থলে হাতে নিয়ে ওজন করে দেখ তোমার কত ভাগ অনুমান ঠিক হয়েছে। কিছুদিন এভাবে অভ্যাস করলে তুমি সহজেই যেকোন জিনিসের ওজন অনুমান করে বলতে পারবে।

সংখ্যা

সংখ্যা নির্ণয় করাও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। এক জায়গায় যত লোক জমা হয়েছে তা অনুমান করতে হলে প্রথমে একটা ছোট অংশ ধরে নিয়ে সেখানে কত লোক বা জিনিস আছে তা সম্ভব হলে গুণে বা অনুমান করে নেবে (অল্প জিনিস অনুমান করা সহজ)। পরে ঐ স্থানে ঐরূপে কয়টা অংশ হতে পারে তা অনুমান করতে পারলেই মোট সংখ্যা পাওয়া যায়। বাগানে বা ক্ষেতের এক সারিতে কতটা গাছ হতে পারে তা অনুমান করে নিয়েও মোট সংখ্যা বের করা যায়। যত অভ্যাস করবে অনুমান তত সঠিক হবে।

সংকেত ঃ ধোঁয়ার সংকেত (SMOKE SIGNAL)

ইতিহাসে যোগাযোগের সবচাইতে পুরাতন মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি ধোঁয়ার সংকেত। অধিক দূরত্বের জন্য এটি একটি কার্যকর দৃশ্যমান যোগাযোগ (Visual Communicatiion) এর মাধ্যম।

সর্বপ্রথম চাইনিজ সৈন্যরা যোগাযোগের জন্য ধোঁয়ার সংকেত ব্যবহার করে। চীনের গ্রেট ওয়াল (Great Wall) শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এক টাওয়ার থেকে অন্য টাওয়ারের সৈনিকদের সতর্ক করতে এ সংকেত ব্যবহার করা হত। এ পদ্ধতিতে তারা মাত্র ১ ঘণ্টারও কম সময়ে ৭৫০ কিঃমিঃ (৪৭০ মাইল) পর্যন্ত নিখুঁতভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারতো।

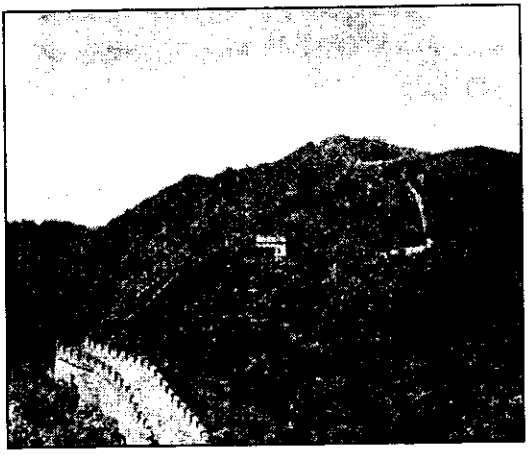

পরিবিয়াস (Polybius). একজন গ্রিক ইতিহাসবিদ খৃষ্টপূর্ব ১৫০-এর দিকে ধোঁয়ার সংকেতের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি **গ্রিক বর্ণমালাকে** সংখ্যায় পরিবর্তন করেন, যা সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগকে **সহজতর করে**। এ পদ্ধতিটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা ব্যবহার করে।

রেড ইন্ডিয়ানরাও ধোঁয়ার সাহায্যে যোগাযোগ করতো। তাদের প্রতিটি গোত্রেরই (tribe) নিজস্ব সংকেত ছিল। আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরী করতো তাদের অবস্থান অন্যদের জানাবার জন্য, এতে করে তারা কোন বিপদের সম্মুখিন হলে খুব দ্রুত সাহায্য আহ্বান করতে পারতো।

ধোঁয়ার সংকেত আজও ব্যবহার করা হয়। রোমে নতুন পোপ (খৃষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু/যাজক) নির্বাচনের সংবাদ প্রদান করার ক্ষেত্রে ধোঁয়া ব্যবহার করা হয়।

কেউ হারিয়ে গেলে ধোঁয়ার মাধ্যমে তার অবস্থান অন্যদের জানানো যায়। একই সাথে সংকেত প্রেরণকারীর বিপদ সম্পর্কে অন্যদের অবগত করা বা সম্ভাব্য বিপদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সংকেত প্রেরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে আজও এটি ব্যবহার করা হয়।

উপস্থিত বক্তৃতা

সাধারণত কোন প্রস্তুতি ছাড়াই এই বক্তৃতা হয়ে থাকে। বেশি বেশি উপস্থিত বক্তৃতা চর্চায় একজন স্কাউটের বুদ্ধির ও মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে। সেই সাথে জানার আগ্রহ ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। স্কাউটরা নিজ নিজ ইউনিটে এর চর্চা করবে। মাঝে মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

যা করতে হবে

- প্রথমে দরকার হবে বিচারকের। বিচারক এক বা একাদিক থাকতে পারেন। স্কাউট লিডার এর ব্যবস্থা করবেন অথবা নিজে বিচারক হিসেবে থাকতে পারেন।
- বিষয় নির্বাচন উপস্থিত বক্তৃতা আয়োজনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিষয়ের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি নির্ভর করবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার উপর। সম্ভব হলে যতজন অংশগ্রহণকারী থাকবে তার থেকে বেশী বিষয় রাখতে হবে। এমন ভাবে তা কাগজে লিখে রাখতে হবে যেন তা বাইরে থেকে পড়া না যায়।
- কোন পাত্রে বা স্থানে বিষয়গুলো রাখতে হবে। প্রথম একজন স্কাউট এসে যে কোন একটি বিষয় সংগ্রহ করে স্কাউট লিডারকে দেখাবে এবং ৩ মিনিট বিষয়টি নিয়ে ভাববে এবং ৩ মিনিট পর বিষয়টি সম্পর্কে বক্তৃতা করবে। প্রথমজন বক্তৃতা শুরু করতেই অপর একজন এসে একটি বিষয় সংগ্রহ করবে এবং সেই বিষয়ে ভাবতে থাকবে। যেহেতু প্রথমজনের বক্তৃতার সময় ৩ মিনিট তাই পরেরজনও ভাবার জন্য ৩ মিনিট সময় পাবে। এভাবেই একের পর এক স্কাউট বক্তৃতা করবে। সবার বক্তৃতা শেষ হলে বিচারক উপস্থিত বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন এবং ফলাফল ঘোষণা করবেন।
- উপস্থিত বক্তৃতা যেকোন বিষয়ে হতে পারে, যেমন মাতা-পিতা, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন, এমর একুশে, শহীদ মিনার, শিক্ষা, আমাদের বিদ্যালয়, স্কাউটিং, ব্যাডেন পাওয়েল ইত্যাদি।

জীবন শিক্ষা

কিশোর কিশোরীদের সেবা (Adolescent Health Care)

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী। এ কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা, জীবন-দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর

বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের শরীরে ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং যৌবনে এসব পরিবর্তনগুলো পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে কৈশোর বলে। এ বয়সে ছেলেদের কিশোর ও মেয়েদের কিশোরী বলা হয়।

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরের ঝুঁকি

- বন্ধুবান্ধবদের চাপে পড়ে তারা বিপদজনক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।
- কৌতুহলের বসে বা কোন অসৎ সঙ্গে পড়ে ধূমপান, মাদকাসক্তি, অনিরাপদ যৌন-আচরণসহ নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে।
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রজননতন্ত্রে নানা ধরনের রোগ সংক্রমণ এবং অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের ঝুঁকি সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে পারে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

- ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন বিভেদ না রেখে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যথাযথ সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। এ বয়সে পুষ্টিকর খাবারের অভাবে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- মেয়েরা কখনোই কম খাবার খাবে না বা নিজেদের অযত্ন করবে না। শারীরিকভাবে দূর্বল এবং অপুষ্টির শিকার কিশোরীরা পরবর্তীকালে গর্ভধারণ করলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।
- এ বয়সী ছেলেমেয়েদের ক্যালসিয়াম, আয়রন, প্রোটিন এবং কার্বো-হাইড্রেট আছে এ রকম খাবার খেতে হবে। সামর্থ্য অনুযায়ী খাদ্য তালিকায় সবুজ শাকসবজি, দেশীয় বিভিন্ন ধরণের ফল, ডাল, সিমের বিচি, মাছ, ডিম, দুধ খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে, তাই এ সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারলে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের যত্ন নিতে পারবে এবং এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ্য-সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়

- পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।
- নিরাপদ যৌন আচরণ সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা।
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনরোগ সম্পর্কে জানা ও প্রতিরোধ করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করা।
- অল্প বয়সে বিয়ে করা থেকে নিজেকে বিরত থাকা এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

নিরাপদ যৌন আচরণের জন্য করণীয়

- ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং শারীরিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে কিশোর-কিশোরীদের এ বয়সে যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সংযত থাকা উচিৎ।
- যৌন চিন্তা যাতে মনে কম আসে সে জন্য পড়াশোনা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন।
- অশ্লীল বইপত্র এবং ভিডিও বা সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকা উচিৎ।
- যৌন নির্যাতনের শিকার হলে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা-বাবা বা বিশ্বস্ত কোনো মানুষকে বিষয়টি জানানো দরকার।
- কোন কারনে যদি কম বয়সে বিয়ে হয়েই যায় তবে অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর পরামর্শ মতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ।

কিম'স গেম

সকলেই আশা করে স্কাউটরা গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে। ভাল পর্যবেক্ষক হওয়ার জন্য মানুষের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে তার সব কয়টিকে অত্যন্ত সম্পর্শকাতর করে গড়ে তুলতে হবে। চোখ হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি। কিম'স গেম মূলত চোখের শক্তি স্পর্শকাতর করে গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকর খেলার ছলে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজে তোমরা তোমাদের অতি পরিচিত ২৪টি জিনিস দিয়ে এই খেলা খেলেছ। এবার তোমাদের ২৪টি চেনা জিনিসের পরিবর্তে ৩৬টি জিনিস দিয়ে এই খেলা খেলতে হবে। তোমরা যদি ঢেকে রাখা ৩৬টি জিনিস এক মিনিট দেখে নির্ভুল ভাবে ২৪টি জিনিসের সঠিক নাম লিখতে বা বলতে পার তাহলে তোমরা এই খেলার বিজয়ী হবে।

পর্যবেক্ষণ কাজে কিম'স গেমের ৩৬টি জিনিসের নাম লেখা চোখ যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি তার কাজ। এ ছাড়াও কানের সাহায্যে কোন শব্দ শুনে তার বিবরণ দেওয়া, না দেখে কোন জিনিস ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ করে তার নাম বলা। জিহবা দিয়ে কোন জিনিসের স্বাদ নিয়ে তার বর্ণনা দেওয়া এবং নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে ঘ্রানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বাড়াতে পার।

স্কাউট সেবা

স্কাউটিং এর মূল ভিত্তি স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনে প্রতিদিন কারো না কারো উপকার (Good Turn) করার তাগিদ রয়েছে। স্কাউটিং এ গুডটার্ন বলতে ছোট ছোট ভাল কাজ করা বুঝায় যেমন– কাউকে পথ চিনতে সাহায্য করা, অপ্রয়োজনে জ্বলছে এরকম বাতি নিভিয়ে দেয়া, পথে পড়ে থাকা কলার খোসা, কাচের টুকরা সরিয়ে ফেলা, কাউকে ঠিকানা জানতে সাহায্য করা ইত্যাদি।

সমাজ সেবা ঃ মূলতঃ গুডটার্ণ থেকেই সমাজ সেবার উদ্ভব। স্কাউটরা ব্যক্তিগতভাবে গুডটার্ণ করে অভ্যস্ত হয়ে উপদল বা ইউনিট ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক কাজ করে। কোন রাস্তায় কাদা মাটির জন্য চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে দেখে স্কাউটরা কয়েকটা ইট মাঝে মাঝে বিছিয়ে দিল যার উপর পা দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে। ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি বের হতে না পেরে পথে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে দেখে কয়েকজন স্কাউট মিলে ঐ ড্রেনটা পরিস্কার করে জলাবদ্ধতা দূর করে দিল। পুকুর/ডোবায় বেশ কচুরীপানা সৃষ্টি হয়েছে এতে মশার উপদ্রব হচ্ছে দেখে স্কাউটরা ঐ পুকুরের কচুরীপানাগুলো পরিস্কার করলো অথবা বর্ষার তোড়ে একটি রাস্তার কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে দেখে স্কাউটরা ঐ রাস্তায় মাটি ফেলে তা ভরাট করে দিল অথবা একটি সাঁকো তৈরী করে দিল। সমাজের মানুষের জন্য স্কাউটরা উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের অনেক কাজ করে। এ ধরনের কাজকে সমাজ সেবামূলক কাজ বলে।

সমাজ উন্নয়ন ঃ সমাজ সেবার পরবর্তী ধাপ সমাজ উন্নয়ন। স্কাউটরা সামজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সমাজের নির্দিষ্ট কোন সমস্যা চিহ্নিত করে সমাজের মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন সেই সমস্যার সমাধান করে এবং যার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় তাকে সমাজ উন্নয়ন বলে। যেমন– কোন একটি পাড়া বা মহল্লার যাতায়াতের পথের একটি বিশেষ জায়গা প্রতিবার বর্ষায় ভেঙ্গে যায়, প্রতিবারই তাতে মাটি ফেলে মেরামত না করলে আর সহজে চলাচল করা যায় না। ঐ এলাকার লোকজন মনে করেন এটি তাদের একটি সমস্যা। এতে তাদের বেশ কিছুদিন দারুণ কষ্ট পেতে হয়। এলাকার এই সমস্যা চিহ্নিত করে স্কাউটরা এলাকার মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে উপলব্ধি করলো সহজে পানি পার হওয়ার জন্য যদি এখানে কোন কালভার্ট তৈরী হতো তাহলে আর এমন হতো না। মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে স্কাউটরা উপলব্ধি করলো যে করেই হোক পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা করা গেছে সমস্যাটির সমাধান হবে এবং এক্ষেত্রে বড় ব্যাসের চারটি পাইপ দিতে

পারলেও এর সমাধান হবে। সেক্ষেত্রে স্কাউটরা দুটো পাইপের মূল্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা ধরে সংগ্রহ করলো। বাকী দুটো পাইপ এলাকার লোকজন সংগ্রহ করলো। পরিবহনের ব্যবস্থা তারা এলাকায় যাদের গরু, মহিষের গাড়ী বা ভ্যানগাড়ী রয়েছে তাতেই সেরে ফেলল। পাইপ বসানোর দিনে মুরুব্বীগণ এলাকার লোকজন সাথে নিয়ে তা স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। রাস্তার পাশে কিছু গাছের চারা লাগিয়ে দিল যাতে গাছের শিকড় রাস্তার মাটিকে ধরে রাখতে পারে। এরূপ কাজের ফলে দেখা গেলো ঐ রাস্তা আর নষ্ট হয় না অর্থাৎ এই কাজটির ফল এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ভোগ করবে। এ ধরণের কাজ সমাজ উন্নয়ন কাজ বলে চিহ্নিত। সমাজের/এলাকাবাসীর চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে স্কাউটদের নেতৃত্ব/উদ্যোগে এলাকাবাসী এবং স্কাউটদের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নিত ঐ নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানকে সমাজ উন্নয়ন কাজ বলে। এ কাজে স্থানীয়ভাবে সরকারী বা বেসরকারী সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

● স্কাউট বন্ধুরা, প্রোগ্রেস ব্যাজে তোমাদের কমপক্ষে দু'টি বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং কমপক্ষে, ১ ঘন্টা সমাজ উন্নয়ন অথবা সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

তোমাদের বিদ্যালয়, নিজ বাড়ি, পাড়া / মহল্লা, গ্রাম ও রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করতে পার। তবে এক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া উত্তম হবে। বছরের বিভিন্ন সময় বৃক্ষরোপণ করতে পার। এছাড়াও প্রতিবছর দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালিত হয়। এসময়ে তোমরা বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পার।

নিজ বিদ্যালয়, পাড়া / মহল্লা, গ্রাম, শহর এবং উপজেলা বা জেলা স্কাউট কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে তোমরা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পার।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

হাঁটু ব্যান্ডেজ (Knee Bandage)

আহত হাঁটু সমকোণ করে রাখ। একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে তার ভূমিতে চওড়া ভাঁজ কর এবং ঐ ব্যান্ডেজটির শীর্ষ হাঁটুর উপর দিয়ে উরুতে রাখ। এবার প্রান্ত

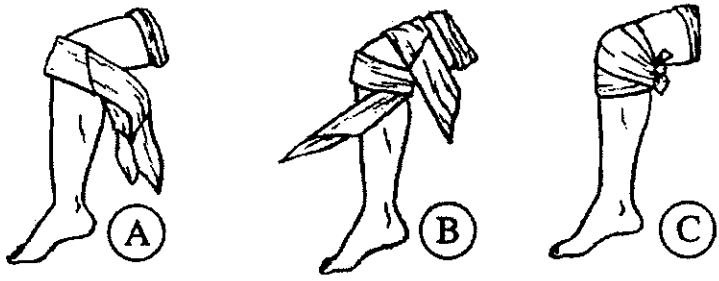

দুইটি প্রথমে উরুর পেছনে দিয়ে আড়াআড়ি করে জড়িয়ে নিয়ে রিফনট দিয়ে বেঁধে দাও। এখন শীর্ষ ভাল করে টেনে রিফনট এর উপর দিযে নিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিপিন দিয়ে আটকে দাও।

হাতের ব্যান্ডেজ (Wrist Bandage)

একটি ত্রিকোন ব্যান্ডেজ নিয়ে তার ভূমিতে একটু চওড়া ভাঁজ করে নাও। এবার ব্যান্ডেজটি হাতের নীচে এমনভাবে স্থাপন কর যাতে ঐ ভাঁজটি কব্জির নীচে থাকে। তারপর শীর্ষটি এমনভাবে ভাঁজ করে কব্জির উপর আন যাতে আংগুলগুলি ঢাকে। এখন দুই প্রান্ত কব্জিতে আড়াআড়িভাবে জড়িয়ে রিফনট দাও। এবার শীর্ষ ভাল করে টেনে গেরোর উপর দিয়ে নিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিপিন দিয়ে আটকিয়ে দাও।

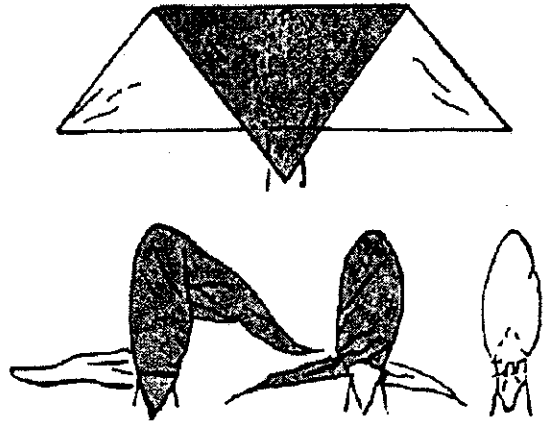

(হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার বিভিন্ন পর্যায়)

কনুইতে ব্যান্ডেজ (ElbowBandage)

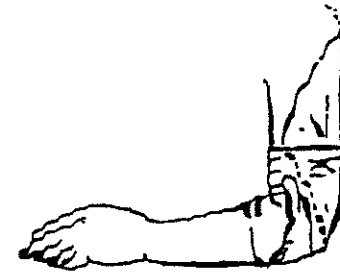

আহত কনুইটি এক সমকোনের মত করে সামনে ভাঁজ করে স্থাপন কর। এবার একটি নিভাঁজ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে ব্যান্ডেজের ভূমিতে এক বা একাধিক চওড়া ভাঁজ কর। তারপর ব্যান্ডেজটিকে শীর্ষ উর্ধ্ববাহুর মধ্যভাগে জড়িয়ে উভয় প্রান্ত উর্ধ্ব বাহুতে বেঁধে দাও। পরিশেষে ভাল করে টেনে নীচের দিকে উল্টিয়ে সেফটিপিনের সাহায্যে ব্যান্ডেজের সাথে আটকিয়ে দাও।

নিম্ন চোয়াল (Jaw Bandage)

নিম্ন চোয়ালে যদি কোন ক্ষত হয় তাহলে প্রথমে ক্ষতস্থানকে কোন জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। এরপর ক্ষতস্থানের উপর প্যাড স্থাপন করতে হবে। এবার একটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজকে সরু ব্যান্ডেজে রূপান্তরিত করে ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ প্যাডের উপর রেখে ব্যান্ডেজের প্রান্তদুটি ঘুরিয়ে মাথার উপর নিয়ে ব্যান্ডেজে একটি হাফ হিচ দিতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয় ঘুরিয়ে মাথার উপর নেয়ার সময় যেন কান ঢাকা না পড়ে। কান দুটি খোলা থাকবে। এবার ঐ হাফ হিচকে আলগা করে ব্যান্ডেজের দুই অংশের একটি কপালে এবং অপরটি মাথার পেছনে নিয়ে যেতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের দুটি প্রান্তকে মাথার উপর দিয়ে ডাক্তারী গেরো বেঁধে ব্যান্ডেজ শেষ করতে হবে। ব্যান্ডেজ বাঁধার পর তা যেন দেখতে পরিপাটি দেখায়।

মাথার খুলি (Skull Bandage)

প্রথমে ক্ষতস্থানকে কোন জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। এরপর ক্ষতস্থানের উপর প্যাড স্থাপন করে (হাড় যদি ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে রিং প্যাড ব্যবহার করতে হবে)। একটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজের ভূমি বরাবর একটি ছোট

ভাঁজ করে নিয়ে ভূমির মধ্যভাগকে কপালের ঠিক মাঝখানে রেখে ব্যান্ডেজের শীর্ষটিকে মাথার পেছনের দিকে নিতে হবে। থেকে মাথার সামনের দিকে এনে কপালের ঠিক মাঝখানে একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। ডাক্তারী গেরো বাঁধা শেষ হলে ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটির অতিরিক্ত অংশগুলিকে দু'দিকের ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

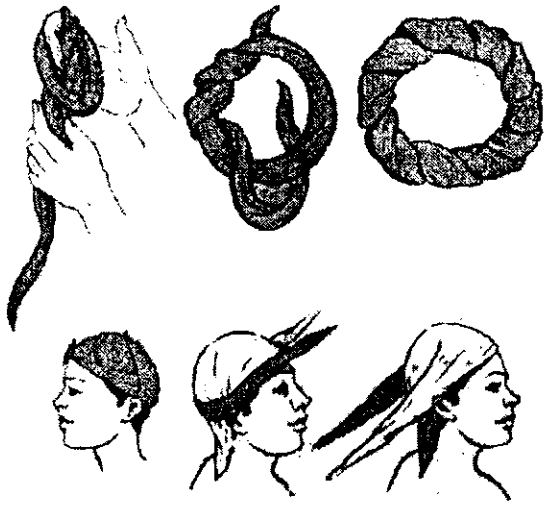

এবার মাথার পেছনে যে শীর্ষ আছে তাকে টেনে এনে মাথার উপর ব্যান্ডেজের অংশের উপর রেখে সেফটিপিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। এই ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্যান্ডেজটি দেখতে খুবই পরিপাটি এবং ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় যেন কান দুটি ব্যান্ডেজে ঢাকা না পড়ে। কান দুটি অবশ্যই খোলা থাকতে হবে।

উপার্জন এবং সঞ্চয় করা

প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী চায় স্বাবলম্বী হতে। এতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। নিজের শখের জিনিসগুলো যদি নিজের উপার্জন করা টাকায় জোগাড় করা যায় তবে তার চেয়ে খুশীর ব্যাপার আর কি? তাই প্রতিটি স্কাউটের উচিত অর্থ উপার্জন করা।

কিন্তু টাকা উপার্জন করাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। যেমন একটা ছেলে তার মায়ের কাছে কিছু পয়সা চাইল। আর মা তাকে পয়সা দিয়ে দিলেন। ছেলে কিছু পয়সা পেল। কিন্তু ঐ পয়সাগুলো ছেলে সঠিক অর্থে উপার্জন করেনি। এটা ছেলের জন্য মায়ের দান মাত্র। এতে বোঝা যায়, চেয়ে নেওয়া টাকা মোটেই উপার্জন নয়।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্কাউটের যেন টাকা উপার্জন করে। কাজ করে টাকা পয়সা জোগাড় করবে। খুব সহজেই পরিশ্রমের বদলে টাকা উপার্জন করা যেতে পারে। যদি তুমি গ্রামের স্কাউট হও, তবে কারো জমিতে শ্রমের কাজ করে দিলে তিনি তোমাকে মজুরি দেবেন তা তোমার উপার্জন করা হবে। তাছাড়াও নিজ বাসায় হাঁস,

মুরগি, কবুতর পুষে এবং তা বিক্রি করে উপার্জন করা যায়। বর্ষাকালে পাটখড়ি (যা লোকে ফেলে দিয়েছে) জোগাড় করে শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করলে টাকা পাবে। যদি শহরের স্কাউট হও তোমরা বাসার পুরনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন জুতা, সেন্ডেল, কাপড়, খাতাপত্র জমিয়ে রাখ। পরে বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করলে যে টাকা হবে তা তোমার উপার্জন করা আয়। তবে শহরেও আজকাল প্রাণী পুষে তা থেকে আয় করা যায়।

তোমার স্কুলে ব্যবহৃত রাফ খাতা লেখা শেষ হয়ে গেলে তা ওজন দরে বিক্রি না করে ওই কাগজ দিয়ে যদি তুমি ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি কর তাহলে কাগজ বেচার চেয়ে বেশি দাম হবে। বাড়িতে রাখা খবরের কাগজ দিয়েও ঠোঙা বানিয়ে তা বিক্রি করে তুমি কিছু আয় করতে পার।

এভাবে তোমার উপার্জন থেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১৫ (পনের) টাকা সঞ্চয় কর। একাজে তোমরা অভিভাবকদের পরামর্শ নেবে। তুমি কিভাবে টাকা উপার্জন ও সঞ্চয় করলে তার বিবরণ তোমার স্কাউট লিডারকে জানাও। নিজের শ্রম দিয়ে টাকা উপার্জন করলে সুখ পাওয়া যায়। তার চেয়েও বেশি সুখ পাওয়া যায় সে টাকা ভাল কাজে খরচ করে।

নিকটবর্তী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান জানা

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জনগণের বন্ধু। জনগণের জান মাল রক্ষার্থে জনগণের সেবায় তারা কাজ করে যায়। বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনে স্কাউটদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। আপতকালীন সময়ে এমনকি স্কাউটদেরকেও তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই প্রত্যেক স্কাউটের তাদের নিজ নিজ এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান ও তাদের যোগাযোগের বিবরণ যেমন ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, আইডি ইত্যাদি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধারণত পুলিশ ও এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সি.আই.ডি, র‍্যাব, ডি.এম.পি, আনসার ও ভি.ডি.পি ইত্যাদির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর দায়িত্ব পালন করে। তুমি নিম্নের ওয়েব সাইটগুলোর মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত যোগাযোগের ঠিকানা ও নাম্বার পাবে।

http://www.police.gov.bd
http://www.rab.gov.bd
http://www.dmp.gov.bd
http://www.ansardpbd.org

ধূমপান

বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বজনীন স্বীকৃত যে, ধূমপান যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ নানা রোগের অন্যতম প্রধান কারণ এবং ধারক ও বাহক।

প্রতিনিয়ত ধূমপানের মাধ্যমে একজন ধূমপায়ী তামাকের বিষাক্ত নিকোটিন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করছেন। দু'টো সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা ইনজেকশনের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করালে মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিটা সিগারেট ধূমপানে মানুষের জীবন থেকে খসে যায় ৫/৬ মিনিট করে আয়ু। একজন ধূমপায়ীর ধূমপানের প্রভাব পড়বে তার পরিবার পরিজনের উপর। এর ফলে মায়ের গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে। ধূমপানের ফলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। শুনলে অবাক হবে একটি সিগারেটে চার হাজারের বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে। যা থেকে পঁচিশটি জটিল রোগ হতে পারে। যে রোগগুলোর পরিণাম মৃত্যু।

ধূমপানে শারীরিক ক্ষতিসমূহ ঃ

নিকোটিন রক্তনালী সরু করে দেয় এবং হার্টের রক্তনালীতে চর্বি জমতে সাহায্য করে। সাথে সাথে এই নিকোটিন রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহকে কমিয়ে দেয়। ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্থ হয়। এতে শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পায়, পাশাপাশি নিকোটিন হার্টের স্বাভাবিক ক্ষমতাকেও হ্রাস করে। ফলে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা যায়। সিগারেটের নিকোটিন সাময়িকভাবে মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করলেও নিকোটিনের দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতি নানাবিধ। নিকোটিন মস্তিষ্কের রক্তনালীকে সরু করে দেয় ফলে মস্তিস্কে রক্ত চলাচল ব্যহত হয়। মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে দূর্বল। ফলে বিশেষ ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যক্ষ অধিক রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন হলে মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় সিগন্যাল প্রদানে বিলম্ব ঘটায়।

২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বের ১৯২টি দেশে পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিজে ধূমপান না করলেও অন্যের ধূমপানের (পরোক্ষ ধূমপান) প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৬,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ১,৬৫,০০০-ই হলো শিশু। শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের কারণে নিউমোনিয়া ও অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার সহ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগও দেখা দেয়। গবেষণায় এও বেরিয়ে এসেছে যে, পরোক্ষ ধূমপান

তুলনায় নারীর উপর বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৮১,০০০ নারী মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত এ জাতীয় আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিলো যে, পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ৪০% শিশু, ৩৩% অধূমপায়ী পুরুষ এবং ৩৫% অধূমপায়ী নারী রয়েছেন। আর পরোক্ষ ধূমপানের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির স্বীকার হচ্ছেন ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষ।

ধূমপানের কোন ধরনের ভাল দিক নাই। এটা পারে শুধু ক্ষতি করতে। শারীরিক-আর্থিক-সামাজিক ক্ষতির একটা বড় অংশ ধূমপানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই সকলের এই ধূমপানের বিষাক্ত ছোবল থেকে দূরে থাকতে হবে। নিজের, পরিবারের ও সমাজের কথা চিন্তা করে ধূমপায়ীদের ধূমপান ছেড়ে দিতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করতে শুধুমাত্র ইচ্ছা শক্তিই। নিজে ধূমপান ত্যাগ করতে হবে ও অন্যকে ধূমপান ছাড়তে উৎসাহিত করতে হবে। ধূমপানে বিষপান। এ এমনই বিষ যা পানকারীকে তো ধ্বংস করেই, পাশাপাশি ধ্বংস করে আশেপাশের সবাইকে। এই সামাজিক ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন সচেতনতা এবং সেই সাথে সকলের ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টা।

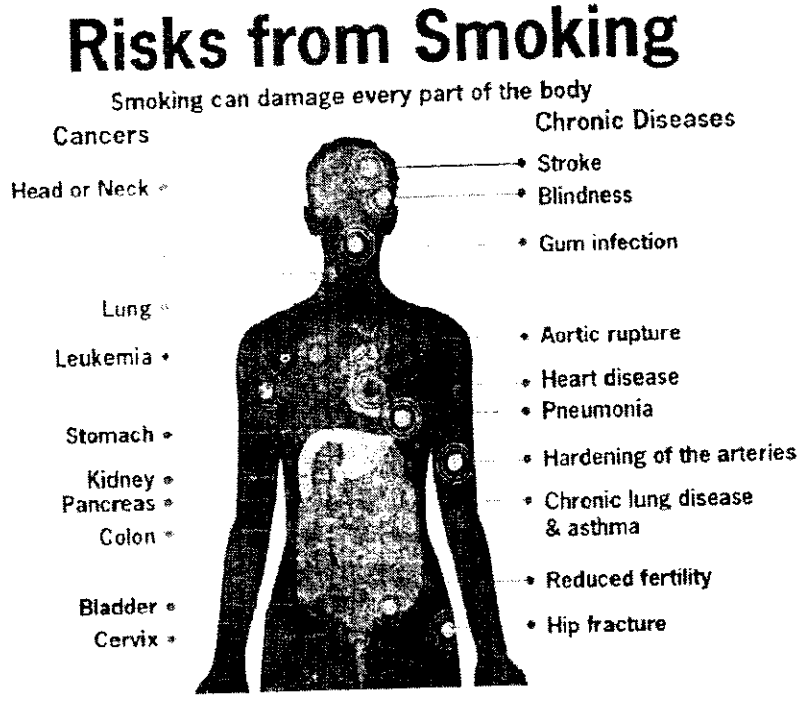

স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ

এশিয়া

এশিয়া হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর জনবহুল মহাদেশ। পৃথিবীর ৩০% ভূখন্ড নিয়ে এশিয়া ঘটিত এবং প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন লোক এ মহাদেশ এ বাস করে যা পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর ৬০%। এশিয়াতে মোট ৪৯টি দেশ আছে। শুধুমাত্র ফিলিস্তিন ছাড়া প্রতিটি দেশই United Nations স্বীকৃতি। নিচে এশিয়ার কয়েকটি দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেয়া হল ঃ

পতাকা	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম
	আফগানিস্তান	কাবুল	আফগানী
	শ্রীলঙ্কা	কলোম্বো	শ্রীলঙ্কান রূপী
	আজারবাইন	বাকু	মানাত
	বাহ্‌রাইন	মানামা	বাহ্‌রাইন দিনার
	বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা
	ভূটান	থিম্পু	গুলট্রাম
	চীন	বেইজিং	উয়ান
	ভারত	নয়াদিল্লী	ভারতীয় রূপী
	ইরান	তেহরান	রিয়াল
	ইরাক	বাগদাদ	ইরাকী দিনার
	মালদ্বীপ	মালে	রূপিয়া
	নেপাল	কাঠমুন্ডু	নেপালী রূপী
	পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	পাকিস্তানি রূপী
	থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	বাথ
	জাপান	টোকিও	ইয়েন

প্রোগ্রেস স্তরে তোমাদেরকে এশিয়ার নূন্যতম ১০টি দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম মনে রাখতে হবে।

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন প্রশাসনের কাজ ও গঠন সম্পর্কে জানা

নিম্নে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন প্রশাসনের কাজ ও গঠন সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

জেলা প্রশাসনের গঠন

বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যমনি হচ্ছে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা। জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করেই সমগ্র জেলার শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। তিনি জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। জেলা প্রশাসনের বিভিন্নমুখী ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত। জেলা প্রশাসন নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। যথাঃ- জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা জজ, জেলার দায়িত্বে নিয়োজতি বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা প্রমুখ।

জেলা প্রশাসনের কাজ ঃ জেলা প্রশাসনের কার্যাবলী নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. প্রশাসন ঃ জেলার প্রশাসন সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের হাতে ন্যস্ত। জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের সহায়তায় ও সহযোগিতায় সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করেন এবং এ সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। জেলা প্রশাসক জেলার জনসাধারণকে সরকারী কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। সরকার ও জেলার জনসাধারণের মধ্যে তিনি যোগসূত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলার প্রশাসন সংক্রান্ত কাজের যে বাস্তব চিত্র তা রিপোর্ট আকারে জেলা প্রশাসক সরকারের কাছে পেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত হয় সরকারী নীতিমালা।

২. শান্তি শৃঙ্খলা ঃ জেলার শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মূল দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। এটি জেলা প্রশাসকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপারসহ তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় জেলার শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করেন।

৩. রাজস্ব সংক্রান্ত ঃ জেলা প্রশাসক জেলা কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলার সরকারী রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত। জেলার জল কর, অন্যান্য কর ও ভূমি রাজস্ব আদায় করা জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব। জেলার সরকারী কোষাগার তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি জেলা খাস মহলের তত্ত্বাবধায়ক। জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, সহকারী কমিশনার (ভূমি), প্রমুখ সরকারী কর্মকর্তা রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে জেলা প্রশাসককে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

৪. সমন্বয় রক্ষা ঃ জেলা প্রশাসক জেলার সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজ জেলার সরকারী সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং নিজ অফিসের সঙ্গে সকল বিভাগের সংযোগ রক্ষা করে চলেন। জেলা প্রশাসক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। জেলার জনস্বার্থ রক্ষা ও জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৫. তত্ত্বাবধায়নমূলক ঃ জেলা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব অনেক। তিনি জেলার অভ্যন্তরের যাবতীয় কাজের পর্যালোচনা করেন এবং কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করেন। জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল সার্জন, জেলা শিক্ষা অফিসার, কারাগার তত্ত্বাবধায়ক ও জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলা প্রশাসক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী তিনি তত্ত্বাবধান করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই সমস্ত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারী নীতি ও সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এইসব স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

৬. উন্নয়নমূলক ঃ জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল চাবিকাঠি। তিনি জেলার বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর তদারক করেন। তিনি জেলা কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার। তিনি এগুলোর উন্নয়ন তৎপরতায় উৎসাহ যোগান এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও নির্দেশ প্রদান করেন। জেলার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৭. **মানবতামূলক** ঃ জেলা প্রশাসক তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। জেলার যে কোন আপদকালীন সময়ে যেমন-ঝড়, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির সময় জেলার অধিবাসীরা জেলা প্রশাসককে তাদের পাশে দেখতে পান এবং জেলা প্রশাসক তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় জেলার অধিবাসীদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৮. **বিচার সংক্রান্ত** ঃ জেলা প্রশাসক একজন বিচারক। তিনি প্রথম শ্রেণীর বিচারক হিসেবে ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন।

৯. **বিবিধ** ঃ জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি হিসেবে জেলা প্রশাসককে তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন সংবাদ পত্র ও প্রকাশনা, আগ্নেয়াস্ত্র, বিষ, স্পিরিট প্রভৃতির লাইসেন্স প্রদান, জেলার বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং এই তথ্য ও পরিসংখ্যান সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ ইত্যাদি। জেলা প্রশাসক একাধারে শাসক, তত্ত্বাবধায়ক, বিচারক এবং জনগণের বন্ধু ও সেবক। জেলা প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসকের বিভিন্নমুখী ভূমিকার জন্য তাঁকে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলা হয়। এছাড়াও তিনি পদাধিকারবলে জেলা স্কাউটসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলা স্কাউট কাউন্সিল ও জেলা নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপজেলা প্রশাসন গঠন

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য সারাদেশকে ৪৮৫টি উপজেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। উপজেলার প্রশাসনের শীর্ষে আছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। উপজেলা নির্বাহী অফিসার হচ্ছেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কেন্দ্র করে উপজেলার সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলার আওতাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং উপজেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করে। উপজেলা পরিষদের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। উপজেলা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সকল কাজ তদারক করেন এবং তিনি উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কমকর্তার সহযোগিতায়

উপজেলার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদাধিকার বলে উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি। তিনি উপজেলা স্কাউট কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপজেলা প্রশাসনের কাজ ঃ উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রশাসন ঃ উপজেলা প্রশাসনের সব দায় দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হাতে ন্যস্ত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর অন্যান্য সহকর্মীর সহায়তায় সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করেন এবং এ সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের কাছে সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরকার ও উপজেলার জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শান্তি শৃঙ্খলা ঃ উপজেলার শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় উপজেলার শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন।

রাজস্ব আদায় ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও তাঁর অফিস সহকারীদের সহায়তায় উপজেলার জলকর ও ভূমি রাজস্ব আদায় করে থাকেন। এটি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অন্যতম দায়িত্ব।

সমন্বয় রক্ষা ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজ উপজেলার সরকারী সব বিভাগের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন এবং নিজ অফিসের সঙ্গে উপজেলার কার্যরত সকল বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। উপজেলার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার জনসাধারণের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। উপজেলার জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

উন্নয়নমূলক ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল চাবিকাঠি। তিনি উপজেলার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলির তদারক করেন। তিনি উপজেলার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা - বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অংশীদার এবং এগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট

সকলকে উৎসাহ যোগান, প্রয়োজনীয় সাহায্য, সহযোগিতা প্রদান করেন। উপজেলার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মানবতামূলক ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহকর্মীদের সহায়তায় থানার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। উপজেলার যে কোন আপদকালীন সময়ে যেমনঃ ঝড়, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির সময় উপজেলার জনসাধারণ তাদের পাশে উপজেলা প্রশাসনকে আপনজন হিসেবে পায়। এসব আপদকালীন সময়ে উপজেলা প্রশাসন উপজেলার জনসাধারণকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। এছাড়াও তিনি উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি হিসেবে স্কাউটিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দায়িত্ব পালন করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন

ইউনিয়ন প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর। কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৮৬,০০০টি। ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য সহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। প্রতি ৫ বৎসর অন্তর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব থাকেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে যাবতীয় কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন। পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং স্কাউটস কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ঃ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী মূলত ৫ ভাগে বিভক্ত। যথাঃ– ১। পৌর কার্যাবলী, ২। পুলিশ ও নিরাপত্তা, ৩। রাজস্ব ও প্রশাসন ৪। উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ এবং ৫। বিচার। এছাড়াও ১০টি বাধ্যতামূলক ও ৩৮টি ঐচ্ছিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনবহুল বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ও কার্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনকল্যাণকে সামনে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ এক ব্যাপক কার্যাবলী সম্পাদনের গুরুদায়িত্ব পালন করছে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ঃ ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকায় শান্তি - শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। ইউনিয়নের শান্তি-শৃঙ্খরা রক্ষা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করে। চৌকিদার ও দফাদারদের নিয়োগ, বেতন ভাতা, পরিচালনা, তদারকী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও আইনের আওতাধীনে অন্যান্য দল গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের।

জনকল্যাণার্থে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের বিভিন্ন জনকল্যাণকর ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়নের কার্য এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধন করা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব। এগুলোর উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। যথাঃ–

ক. যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা-ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;
খ. খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং পার্ক তৈরি;
গ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ;
ঘ. গোরস্থান নির্মাণ ও গোরস্থানের পরিত্রতা রক্ষা;
ঙ. শ্মশান ঘাট নির্মাণ ও শ্মশান ঘাটের পবিত্রতা রক্ষা;
চ. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় পদ্ধতির প্রচলন;
ছ. জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
জ. বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ, বাঁধের সংরক্ষণ ও পানি সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ. বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন;
ঞ. কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ;
ট. বন ও পশু সংরক্ষণ;
ঠ. কুটির শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
ড. জনসাধারণের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন;
ঢ. এতিম ও দুস্থদের জন্য এতিমখানা ও দুস্থ পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা;
ণ. জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

ত. নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

থ. পাঠাগার স্থাপন;

দ. শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিমূলক উৎসবের আয়োজন;

ধ. ইউনিয়নের জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন সংরক্ষণ;

ন. গবাদি পশু বিক্রি রেজিস্ট্রেশন সংরক্ষণ;

প. সরকারী উৎসবাদি উদ্‌যাপন ইত্যাদি;

সেবামূলক কার্যাবলী ঃ ইউনিয়নের দুস্থ, পঙ্গু, অন্ধ ও আর্থিক বিপর্যস্ত ব্যক্তিবর্গকে ইউনিয়ন পরিষদ সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে। আপদকালে যথাঃ বন্যা, খরা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময় ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সেবায় এগিয়ে আসে। ইউনিয়নের কার্য এলাকায় ভূমি কর ও অন্যান্য কর আদায়ের ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারী কর্মকর্তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে। কোন সরকারী সম্পত্তি বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে ইউনিয়ন পরিষদ এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ঃ ইউনিয়নের কার্য এলাকায় কৃষি উৎপাদন প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে এলাকাবাসীদের চাহিদা ও সম্মতির সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ, কীটনাশক, ঔষধ, স্প্রে মেশিন ইত্যাদি উপকরণসমূহ কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য সরকারী বিভাগসমূহের সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালায় এবং এই আন্দোলনকে সফল করে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং কৃষি ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করে।

পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলীকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী সম্পর্কে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নিজ কার্য এলাকায় জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষাদান, জন্মনিবোধ সংক্রান্ত প্রচারণা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান ইত্যাদি করে।

সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নিজ কার্য এলাকার বিভিন্ন প্রকার অপরাধ নিরোধের জন্য উপজেলা প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সংবাদ সরবরাহ করে এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার বিষয়ে পুলিশকে সহায়তা প্রদান করে। ইউনিয়ন পরিষদ সরকার অথবা বৈধ কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ জনসাধারণের মধ্যে যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করে।

বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "সালিসী আদালত" হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ ছোট ছোট মামলা মোকদ্দমার বিচার করে। বাদী ও বিবাদী পক্ষের ২ জন করে মোট ৪ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই মোট ৫ জন নিয়ে এই "সালিসী আদালত" গঠিত হয়।

পরিবেশ

পরিবেশের প্রতিটা উপাদানের সুসমন্বিত রূপই হল সুস্থ্য পরিবেশ। এটি নির্ভর করে এর চারপাশের ভৌত অবস্থান, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী নানা উপাদান, জীব ও জৈব উপাদানের সামষ্টিক ভারসাম্যের উপর। এই সুসম্বন্বিত রূপের ব্যতয়ই পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায় এবং পরিবেশের অবক্ষয় দেখা দেয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্যে দু'ধরনের কারণকে চিহ্নিত করা যায়। যথাঃ-

১। প্রাকৃতিক কারণ।
২। মানব সৃষ্ট কারণ।

প্রাকৃতিক কারণ ঃ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ যেমনঃ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদিতে পরিবেশের উপর মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। শুধুমাত্র ২০১২ সালে ৯০৫ টি বড় ধরনের প্রাকৃতকি দুর্যোগ ঘটেছিল তার মধ্যে ৯৩% ছিল আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট বিপর্যয় যাতে ক্ষতির

পরিমান ছিল ১৭০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। ২০১৩ সালের নভেম্বরে ফিলিপাইনে আঘাত হানে সাইক্লোন হাইয়ান। ঘণ্টায় ১৭০ মাইলের বেশী বেগের এই সামুদ্রিক ঝড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে যায় তাকলোবান যাতে নিহত হয় পাঁচ হাজারের ও বেশী মানুষ। এধরনের কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিবরণ নিচে দেয়া হল–

হিমবাহ (Avalanche) ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আল্পস পর্বতমালায় অষ্ট্রেলিয়া-ইটালিয়ান বাহিনীর প্রায় ৪০০,০০-৮০০,০০ সৈন্য হিমবাহের কারণে বরফ ধ্বসে মারা যায়।

ভূমিকম্প (Earth Quake) ঃ

ভূমিকম্প এবং তৎপরবর্তী সুনামী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি বড় কারণ। ২০০৪ সালে ভারতীয় উপ-মহাসাগরে প্রায় ৯.১-৯.৩ মাত্রার যে ভূমিকম্প হয় তার ফলশ্রুতিতে সুনামীতে প্রায় ২২৯,০০০ লোক প্রাণ হারায়। এছাড়া ২০১১ সালে তহুকুতে প্রায় ১৩,০০০; ২০১০ সালে চিলিতে ৫২৫ জন; ২০০৮ সালে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের ভূমিকম্প ও সুনামীতে প্রায় ৬১,১৫০ জন প্রাণ হারায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত (Volcanic Eruption) ঃ

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেমন প্রচন্ড দাবদাহে আশেপাশের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি এর লাভা ক্ষতিগ্রস্থ করে বাড়িঘর-গাছপালাকে। অগ্ন্যুৎপাতের কারণে যে ছাই তৈরী হয় তা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে মানুষ, পশুপাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি এই ধূয়ার মেঘে ঢাকা পড়ে সংশ্লিষ্ট জায়গার আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

ধারণা করা হয় ৭৫,০০০ থেকে ৮০,০০০ বছর আগে লেকটোবার বিপর্যয়ে প্রায় ১০,০০০ লোক প্রাণ হারিয়েছিল এবং উত্তর গোলার্ধের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

বন্যা (Flood) ঃ

বন্যা প্রাকৃতকি বিপর্যয়ের একটি ভয়াবহ উদাহরণ। ১৯৮৯ সালে জনস্টাউন বন্যায় প্রায় ২,২০০ মানুষ মারা যায়। ১৯৩১ সালে হোয়াংহো নদীতে যে ভয়ংকর বন্যা হয় তা মানব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম বিপর্যয় গুলোর মধ্যে অন্যতম। একে Great Flood বলা যাতে ৮০০,০০০ থেকে ৪,০০০,০০০ লোক প্রাণ হারায়। এছাড়া, ১৯৯৮ সালে চীনের ইয়াংজী নদীর বন্যায় ১৪,০০০,০০০ লোক হয়ে পড়ে আশ্রয়হীন। আমাদের দেশে বন্যায় প্রতিবছর প্রচুর মানুষ মারা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয় লক্ষ কোটি টাকার বাড়িঘর - ধন সম্পদ।

এছাড়া ঝড় (Cyclone/Typhoon), তুষার ঝড় (Blizzard), খরা (Drought), ঘূর্ণিঝড় (Tornado), দাবানল (wildfire) প্রভৃতির কারণেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

মানবসৃষ্ট কারণ ঃ

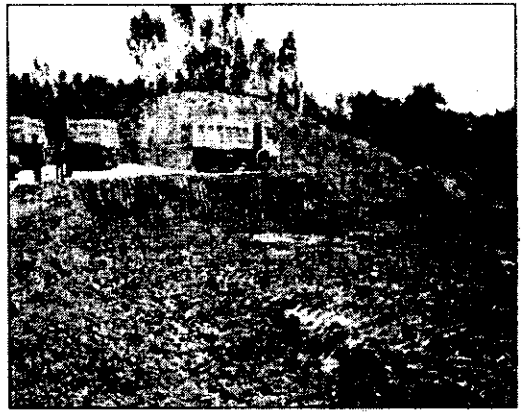

মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সৃষ্ট ক্ষতিকর পদার্থ ও তা নির্গমনের কারণে পরিবেশের উপর মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। ২০১৩ সালে ফুকুসিমা পারমানবিক বিপর্যয়ে উচ্চ তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে যার দরুন ১৬০,০০০ মানুষ এখনও আশ্রিত হয়ে অস্থায়ী বাড়িতে বসবাস করছে। এটি পরিশোধনে নূন্যতম আরো ১০ বিলিয়ন ডলারে ও বেশী ব্যয় হবে। এরকম আরও কিছু মানবসৃষ্ট বিপর্যয় হল ঃ

সেভেসো বিপর্যয়- (Seveso Disaster) ঃ

১৯৭৬ সালে ডাই অক্সিন নির্গমনের ফলে এ বিপর্যয়ের শুরু। এতে যদিও কোনো মানুষ মারা যায়নি তবে দু'বছরের মধ্যে ৮০০০ গবাদিপশু ধ্বংস করতে হয়েছিল।

ভূপাল বিপর্যয় (Bhupul Disaster) ঃ ১৯৮৪ সালে ভারতে বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক নির্গমনে প্রায় ৮,০০০ লোক দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। আরো প্রায় ৫৫৮,১২৫ জন আহত হয় যার মধ্যে ৩৮,৪৭৮ জন আংশিক এবং ৩,৯০০ জন পুরোপুরি পঙ্গুত্ব বরণ করে।

চেরনোবিল বিপর্যয়- (Chernobyl Disaster) ঃ

১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিলে পারমানবিক চুল্লীর বিস্ফোরণে পারমানবিক রশ্মির বিক্রিয়ায় ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগে প্রায় ৪,০০০ লোক মারা যায়।

এ্যাক্সন ভালডেজ বিপর্যয়- (Exxon Valdez Oil Spill) ঃ

১৯৮৯ সালে এ বিপর্যয়ে প্রায় ১৬০,০০০ থেকে ৭৫০,০০০ ব্যারেল তেল ছড়িয়ে

পড়েছিল যাতে সামুদ্রিক প্রাণী ও সংশ্লিষ্ট পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

প্রতিকারের উপায় ঃ

এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিকারের উপায় হলো পরিবশের উপাদানগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় বজায় রাখা। আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলো করে এ বিপর্যয়গুলো সীমিত করতে পারি ঃ

- বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, তেজসক্রিয় দুষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি কমানো বা বন্ধ করা।
- অনবায়নযোগ্য জ্বালানী যেমন : কয়লা, গ্যাস, তেল ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস করা।
- বিকল্প জ্বালানী (Green fuel) এবং স্বল্প কার্বনযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
- মাটি, বায়ু, পানি ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহার করা।
- বাস্তুসংস্থান (ecosystem) নিশ্চিত করা যাতে গাছপালা, পশুপাখির সাথে তাদের পরিপার্শ্বের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তা সমুন্নত থাকে।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত রাখা।
- প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে নিশ্চিহ্ন প্রায় ও বিপন্ন জীবজন্তু ও গাছপালা সংরক্ষণ করা। এক কথায় পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য (Biodiversity) ও বাস্তুসংস্থান (ecosystems) সংরক্ষণ করা যাতে এর উপর নির্ভরশীল মানবগোষ্ঠী ও অন্যান্য জীব বেঁচে থাকতে পারে।

প্রযুক্তি শেখা

মানচিত্র

সংজ্ঞা ঃ স্কেলের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডের সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদর্শিত রেখাচিত্রই হচ্ছে মানচিত্র। ভূমিতে অবস্থিত বিভিন্ন জিনিস বা বস্তুর সার্বিক অবস্থান মানচিত্রে দেখাতে হয়। মানচিত্রে থাকে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের চিত্র তবে তার মধ্যেও নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে ঃ

ক. ভূমিতে অবস্থিত সকল বিষয়ের অবস্থান মানচিত্রে দেখানো সম্ভব নয়, তাহলে মানচিত্র পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

খ. কোন ম্যাপেই হালনাগাদ সকল তথ্য সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত নদী ও জলাশয়ের অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। বন সৃষ্টি, বন কর্তন, নতুন নির্মাণ কাজ সম্পাদন, পুরাতন নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি কারণে হালনাগাদ সকল তথ্য সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়।

গ. পৃথিবী গোলাকার কিন্তু যে কাগজে ম্যাপ আঁকা হয় তা সমতল। কাজেই পরিপূর্ণভাবে ভূমির চিত্র কাগজে তোলা সম্ভব নয়।

মানচিত্রের শ্রেণী বিভাগ ঃ ভূমিতে সকল বিষয়ের অবস্থান মানচিত্রে দেখানো সম্ভব নয় কাজেই কোন বিশেষ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়। ধরা যাক শিক্ষা দফতর কোন একটি জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান জানতে চায়। সেক্ষেত্রে জেলার সীমানা, উপজেলার সীমানা, ইউনিয়নের সীমানা, বড় রাস্তা ও রেলপথসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ম্যাপে দেখানো যেতে পারে। যদি উক্ত ম্যাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করতে চাও অনেক জিনিসের ভিড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া দুস্কর হবে। মানচিত্রকে মোটামুটি দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–

ক. রাজনৈতিক মানচিত্র ঃ যে মানচিত্রে কোন নির্দিষ্ট বিভাগের সীমানা, জেলার সীমানা, উপজেলার সীমানা ও ইউনিয়নের সীমানা বিভিন্ন রং ব্যবহার করে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে এবং শহর, যোগাযোগ ব্যবস্থা (সড়ক পথ, রেলপথ, আকাশ পথ ও নৌপথ), কলকারখানার অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে, সে সব মানচিত্রকে রাজনৈতিক মানচিত্র বলে।

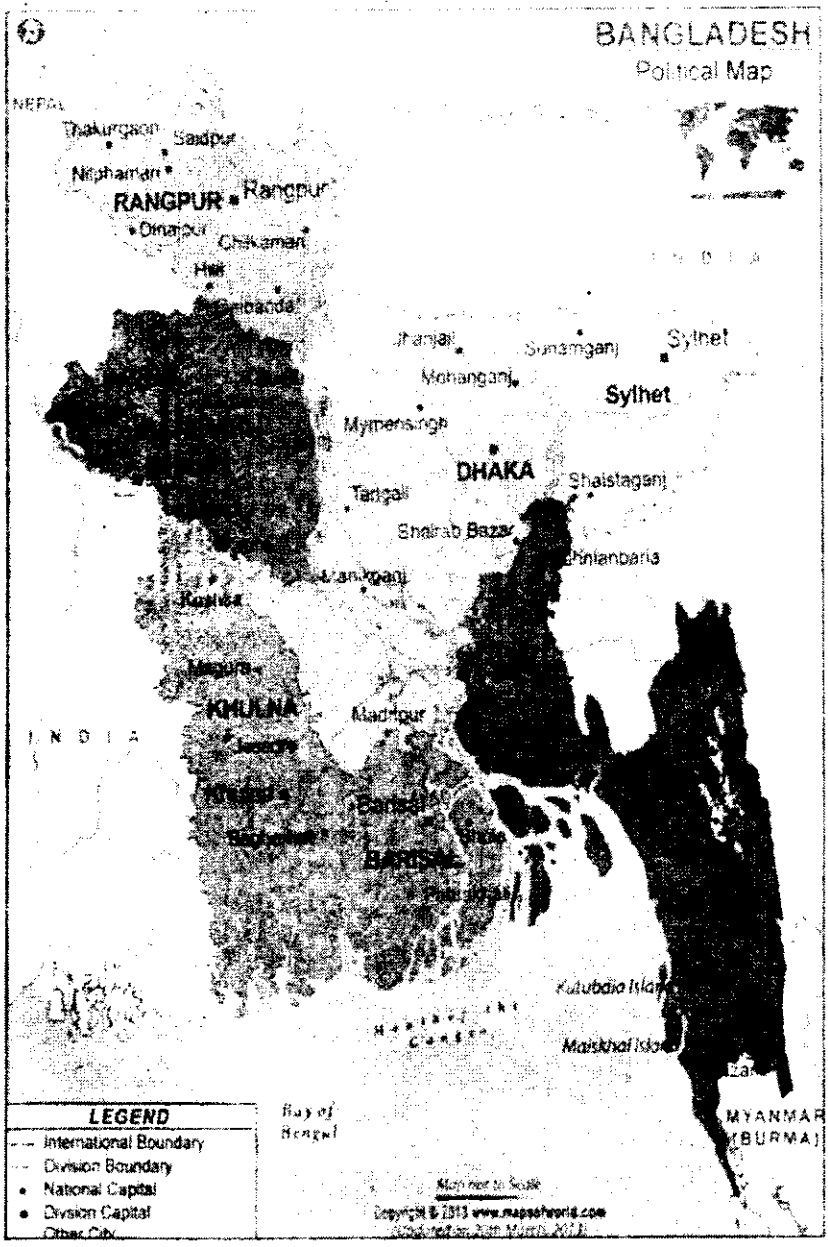

BANGLADESH
Political Map
NEPAL
Thakurgaon
Saidpur
Nilphamari
RANGPUR
Rangpur
Dinajpur
Sunamganj
Sylhet
Mohanganj
Sylhet
Mymensingh
DHAKA
Shaistaganj
Tangail
Bhairab Bazar
KHULNA
I N D I A
Barisal
BARISAL
MYANMAR
(BURMA)
Bay of
Bengal
LEGEND
International Boundary
Division Boundary
National Capital
Division Capital
Map not to Scale

রাজনৈতিক মানচিত্র

খ. প্রাকৃতিক মানচিত্র ঃ যে মানচিত্রে কোন নির্দিষ্ট এলাকার মূল ভূ-খণ্ডের উপর যা কিছু আছে, যেমন-নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, হ্রদ, মরুভূমি, নিম্নভূমি, জলাভূমি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেখান হয় সেসব মানচিত্রকে প্রাকৃতিক মানচিত্র বলে। প্রাকৃতিক মানচিত্রে বিভাগের সীমানা, জেলার সীমানা, থানার সীমানা, ইউনিয়নের সীমানা পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে না।

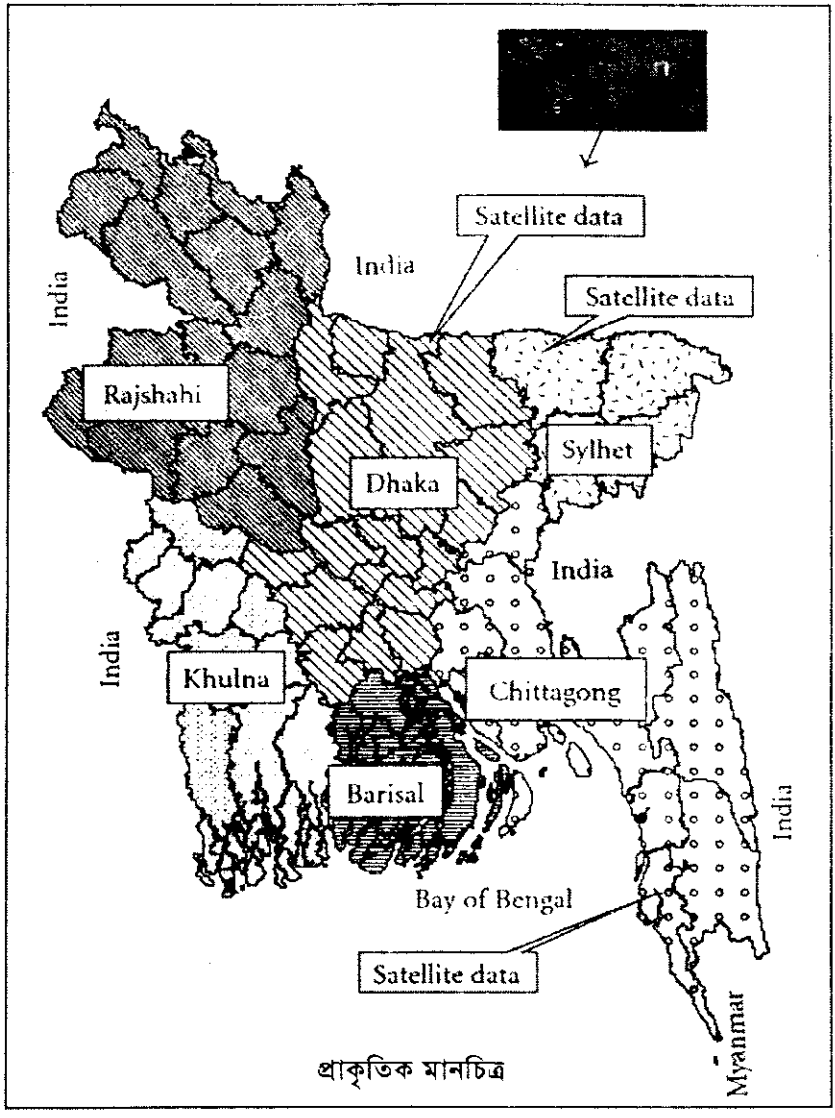

প্রাকৃতিক মানচিত্র

মানচিত্রে আঁকার জন্য যে সমস্ত তথ্যের প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে, দিক, দূরত্ব, বিস্তারিত চিহ্ন এবং ভূমির উচ্চতা। এ বিষয়গুলো মনে রাখার জন্য আমরা ৪টি ব্যবহার করে থাকি।

D = Direction (দিক)
D = Distance (দূরত্ব)
D = Details (বিস্তারিত চিহ্ন)
D = Difference in height (ভূমির বন্ধুরতা)

এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হতে পারলেই তুমি মানচিত্র আঁকতে পারবে।

দিক (Direction)ঃ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজে তুমি কম্পাস সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। তুমি জান যে কম্পাসে ৩৬০ ডিগ্রী রয়েছে। উত্তর দিক ০ বা ৩৬০ ডিগ্রিতে নির্দেশ করা হয়। সাধারণত যে কাগজে ম্যাপ আঁকা হয় তার উপরের দিককে উত্তর দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তোমার কাগজেও অবশ্য স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিক নির্দেশ করতে হবে। মানচিত্র আঁকার জন্য কম্পাসের উত্তর দিক ও তোমার কাগজে চিহ্নিত উত্তর দিক একই লাইনে অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজনবোধে কাগজটির অবস্থান পরিবর্তন করে মিলিয়ে নিতে হবে। এখন ম্যাপ আঁকার জন্য তোমার ইচ্ছে বা প্রয়োজন মাফিক দিক নির্দেশ করতে পার।

দুরত্ব (Distance) ঃ ম্যাপে নির্দেশিত দূরত্বের সঙ্গে বাস্তব দূরত্বের সামঞ্জস্য না রাখা গেলে ম্যাপ আঁকা সম্ভব নয়। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্কেলে ম্যাপ আঁকতে হয়। প্রকৃত দূরত্বের সঙ্গে মানচিত্রের দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে। স্কেল ১ সেন্টিমিটার সমান ১ কিলোমিটার এর অর্থ হচ্ছে ঐ ম্যাপে ১ সেঃ মিঃ দূরত্ব দেখালে প্রকৃত দূরত্ব হবে ১ কিঃ মিঃ। ম্যাপের এক কোণায় দুরত্বসূচক স্কেল দেখাতে হবে।

স্কেলের উপর ভিত্তি করে মানচিত্র আঁকা হয়। যে মানচিত্রে একক দূরত্বের জন্য প্রকৃত দূরত্ব অনেক বেশী দেখানো হয় উক্ত মানচিত্রকে বড় স্কেল (Large Scale) মানচিত্র বলে। সাধারণত যে সমস্ত মানচিত্রে ১ ইঞ্চি বা ১ সেঃ মিঃ সমান ১০০ মাইল বা ১০০ কিলোমিটার দেখানো থাকে সে মানচিত্রকে বড় স্কেল মানচিত্র বলে। সাধারণত ছোট স্কেল (Large Scale) মানচিত্রে ১ ইঞ্চি বা ১ সেঃ মিঃ সমান ১ মাইল বা ১ কিলোমিটার দেখানো হয়। এই দূরত্ব ১০০ মাইল বা ১০০ কিলোমিটারের এর বেশি হওয়া সমীচীন নয়।

বিস্তারিত (Details) চিহ্ন ঃ প্রত্যেক ম্যাপে পথঘাট, রেলপথ, বিদ্যালয়, ডাকঘর, মসজিদ, আবাদী-অনাবাদী জমি, জঙ্গল, খাল, বিল, নদী ইত্যাদি দেখাতে হয়

কতগুলো চিহ্নের সাহায্যে। সেই চিহ্নগুলোকে প্রচলিত চিহ্ন (Conventional Sign) বলা হয়। নিম্নে কতগুলো প্রচলিত চিহ্ন দেওয়া হল। হাইকিং, ভ্রমণ বা গ্রাম জরিপ কাজে হাতে কলমে মানচিত্র আঁকার সময় এই চিহ্ন ব্যবহার করলে এগুলো ভাল রপ্ত করতে পারবে।

নদী ও পুল 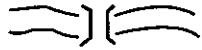	রেলপথ (ন্যারো গেজ)
রেলপথ (ব্রডগেজ সিঙ্গেল) 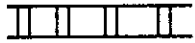	রেলপথ (ব্রডগেজ ডবল লাইন)
পাকা রাস্তা 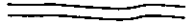	কাঁচা রাস্তা
পায়ে কাঁটা পথ	ভূমির উচ্চতা নির্দেশক (কন্টুর)
জলাশয় (হ্রদ)	জলাভূমি
ঘাষ	নারিকেল গাছ 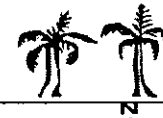
বড় গাছ	উত্তর দিক
দিক নির্দেশক	মন্দির
মসজিদ 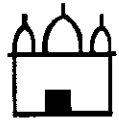	গীর্জা
বিদ্যালয়	ডাকঘর 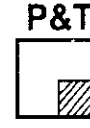

ভূমির উচ্চতা (Difference in hight) ঃ সমুদ্র সমতল থেকে কোন স্থানের উচ্চতাকে ভূমির উচ্চতা বলে।

মানচিত্রে ভূমির উচ্চতা ও গভীরতা দেখাবার নিয়ম ঃ যেখানে পাহাড় কিংবা উঁচু টিলা আছে সেখানে ম্যাপে উচ্চতা বিশেষ লাইন দিয়ে দেখাতে হয়। ঘন ও ছোট ছোট বাঁকা লাইন দিয়ে ঠিকভাবে উচ্চতা দেখানো যায়। সমান উঁচু জায়গার উপর দিয়ে আঁকা রেখাকে সমউঁচ্চ রেখা বলে। বিভিন্ন উচ্চতার কতগুলো সমউঁচ্চ রেখা থেকে আমরা ভূমির উচ্চতা ও ঢাল সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। সমউঁচ্চ রেখাগুলো খুব কাছাকাছি হলে ভূমির ঢাল খুব খাড়া বুঝতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাগরের উপর থেকে ভূমির উচ্চতা পরিমাপ করা হয়।

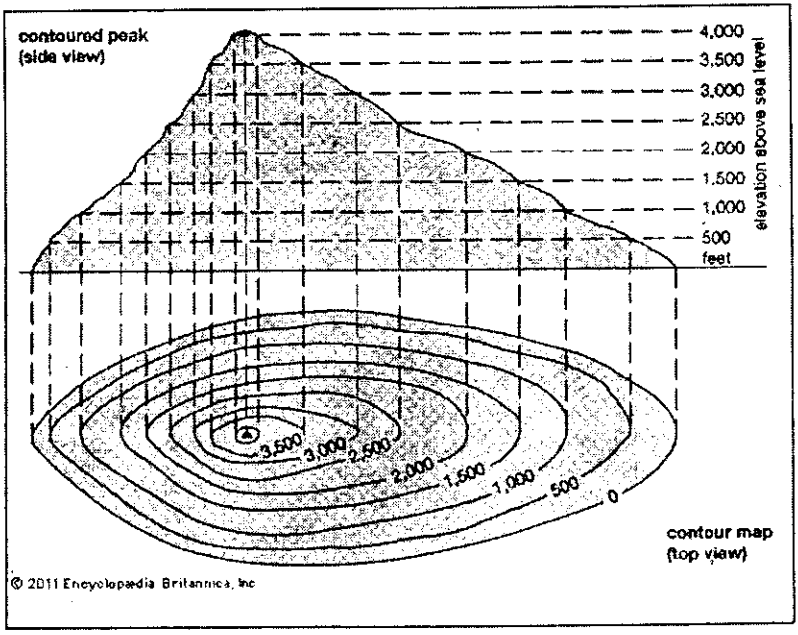

মানচিত্র আঁকা ঃ মানচিত্র আঁকার নানা রকম নিয়ম আছে। যেমন ট্রাভোর্স মেথড, চেইন মেথড, ট্রায়াংগুলার মেথড ইত্যাদি। এর মধ্যে ট্রাভার্স মেথড স্কাউটদের জন্য সুবিধাজনক। এ নিয়ম সাধারণত ছোট গলি বা লম্বা রাস্তা মাপজোকের জন্য নেওয়া হয়। মাঠে বা রাস্তায় বসে ম্যাপ আঁকার দরকার হয় না। কেবল খুঁটিনাটি বিবরণ ফিল্ড বুকে টুকে নিলে হয়। পরে ঘরে বা স্কুলে ফিরে ম্যাপ আঁকা যায়। মানচিত্র মাধ্যমে কম্পাস দক্ষতার চমৎকার অনুশীলন করা যায়।

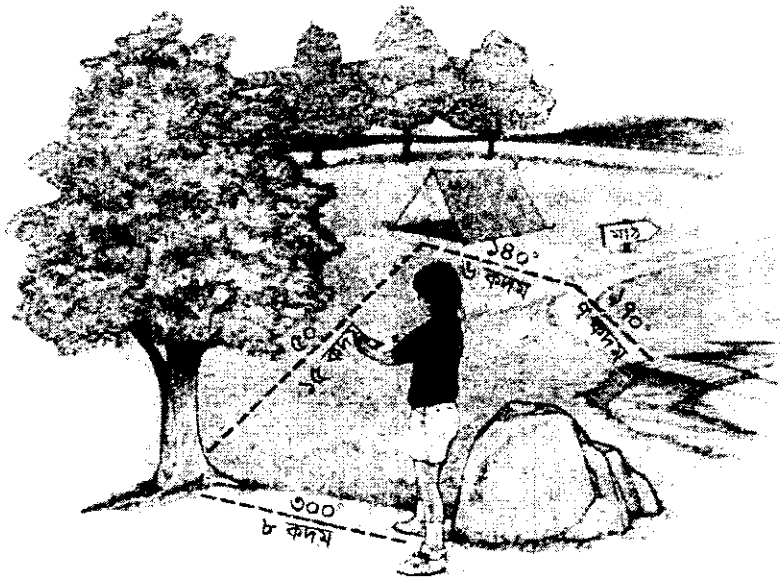

উপরের নমুনা ছবিতে একজন স্কাউট একটি বড় পাথর, একটি গাছ, ও তাঁবুর পাশ দিয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে পথ চলছে। এটি এক খণ্ড কাগজে কিভাবে তা তুলে ধরা যায় বা ম্যাপিং করা যায় তা নিচের ছবিটিতে ফুটে উঠেছে।

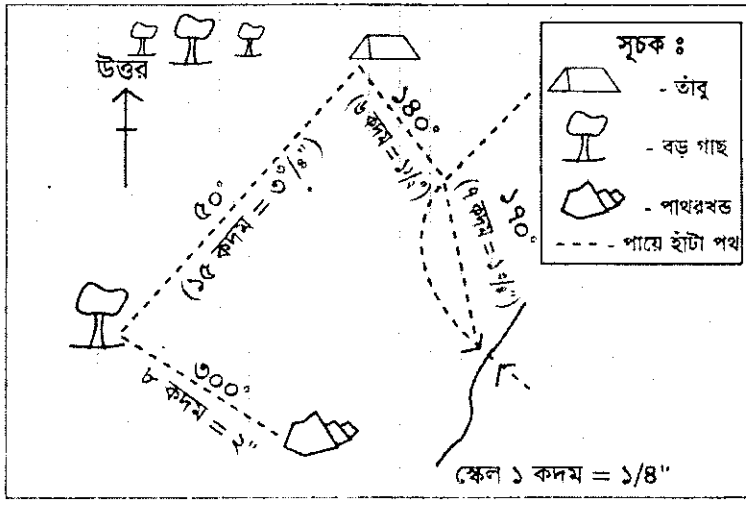

মানচিত্র আঁকার জন্যে তোমার যেটি প্রয়োজন হবে, তা হল একটি কম্পাস, পেন্সিল, স্কেল এবং এক খন্ড কাগজ। সবচেয়ে ভালো হয় কাগজটি যদি হয় একটি গ্রাফ পেপার। না হলে কাগজটিকে পাশাপাশি ভাঁজ করে নাও। মনে রাখবে ম্যাপের উপরের দিকটি উত্তর দিক নির্দেশ করে। এবার কাগজটির মাঝের বিন্দুতে একটি ছোট দাগ দিয়ে রাখ এটি হবে মানচিত্রের কেন্দ্র বিন্দু। কেন্দ্রবিন্দুকে মাঝে রেখে মানচিত্রটি অংকন করতে হবে। কেন্দ্রকে মাঝে রেখে যেখান থেকে পথটি শুরু হয়েছে যেই পয়েন্টটি নির্দিষ্ট করতে হবে। এখানে পাথর খন্ডের পাশ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। এই বিন্দুটি হবে ১ নম্বর বিন্দু। আর ৩০০ ডিগ্রিতে ৮ কদম গিয়ে থেমেছে বড় গাছের পাশে, যাকে ধরে নিই ২ নম্বর বিন্দু হিসেবে।

এবার চার কদমকে এক ইঞ্চি ধরে স্কেল ঠিক করি। ১ নম্বর বিন্দু হতে কম্পাস অনুযায়ী ৩০০ ডিগ্রি ধরে ২ ইঞ্চি একটি দাগ টানি। Conventional Sign হিসেবে বড় গাছের প্রতীক ও পাথর আঁকি। পরবর্তী ধাপে বড় গাছ থেকে ৫০ ডিগ্রি তে ১৫ কদম দিয়ে তাঁবুর সামনে থেমেছে। তাঁবুর সামনের অংশকে ৩ নম্বর বিন্দু ধরে ২ ও ৩ নম্বর বিন্দুতে কম্পাস অনুযায়ী ৫০ ডিগ্রি ধরে ৩ ইঞ্চি দাগ টানি। একই ভাবে চলার পথের অন্যান্য অংশগুলো মানচিত্রে অংকন করি। অংকন শেষে পূনরায় দেখে নিই মানচিত্রে দিক নির্দেশক চিহ্ন, স্কেল, প্রচলিত চিহ্নগুলো যথাযথ ভাবে দেয়া হয়েছে কিনা। যতই চর্চা করবে তোমার আঁকা মানচিত্র ততই গোছানো আর সুন্দর হবে।

ফিল্ড বুক তৈরি ঃ ফিল্ড বুক শুরু করতে হয় নিচ থেকে উপরের দিকে। মনে করি, যাত্রা স্থান 'ক'। এই 'ক' স্থানে যাত্রা আরম্ভ কথাটি লিখতে হবে। এরপরে উল্লেখ করতে হবে এই যাত্রা আরম্ভ স্থান থেকে কত ডিগ্রিতে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এই দূরত্বের মাঝে ডানদিকে এবং বামদিকে কি কি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে সে বিষয়গুলো সরল রেখার ডানদিকে এবং বাম দিকে কত দূরে দূরে আছে তার উল্লেখ করতে হবে। এভাবে যাত্রা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যাত্রা পথের ডিগ্রি, দুরত্ব ও দু'পাশের দর্শনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথা সম্বলিত করে ফিল্ড বুক তৈরি করতে হয়।

ফিল্ড বুকের একটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

গন্তব্য স্থান

৫১৭ কদম ঃ থানা
৪০১ কদম ঃ বড় পুকুর
১৩২ কদম ঃ তাল গাছের সারি

৬৮৫ কদম
১৪৫ ডিগ্রী

৪৪৮ ঃ খেলার বড় মাঠ
২৫১ কদম ঃ জলাভূমি
১৬৮ কদম ঃ ঝাউ গাছের সারি

৭৫ কদম ঃ নলকূপ
৫০ কদম ঃ কুঁড়ে ঘর

২৬০ কদম
৮০ ডিগ্রী

১৫০ কদম ঃ বড় কদম গাছ

১৫৭ কদম ঃ তেলের মিল
৯৫ কদম ঃ চালের মিল

৪৩৫ কদম
৬৫ ডিগ্রী

১২৯ কদম ঃ বাজার
৭৫ কদম ঃ বড় পুকুর

১২০ কদম ঃ রেলওয়ে ক্রসিং
৪০ কদম ঃ হাসপাতাল

৪০০ কদম
৬০ ডিগ্রী

৩৩০ কদম ঃ খেলার মাঠ
১২০ কদম ঃ পুকুর

২০০ কদম ঃ ডাকঘর
১২৫ কদম ঃ মন্দির

২২০ কদম
৭৫ ডিগ্রী

১৯৭ কদম ঃ মসজিদ
১৫৫ কদম ঃ তেলের মিল

৯১ কদম ঃ বাজার
৪৫ কদম ঃ চালের মিল
২০ কদম ঃ বড় দিঘী

১২০ কদম
৬০ ডিগ্রী

৭৫ কদম ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬২ কদম ঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৫০ কদম ঃ বড় বট গাছ

যাত্রা আরম্ভ

উপরে সে সকল দর্শনীয় বস্তুর নাম বলা হল তা মানচিত্র অঙ্কনের সময় ব্যবহারে সহায়তা করে। তবে হাইকিংয়ে ব্যবহারের জন্য যে ফিল্ড বুক তৈরী করা হয় তার দুইধারে উল্লেখযোগ্য বস্তুর বিবরণ নাও থাকতে পারে। যারা হাইকে যাবে তারা ফিল্ড বুক অনুসরণ করে পথ চলবে এবং চলার পথে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তুর তালিকা লিখবে যাতে গন্তব্যে পৌছানোর পর হাইক রিপোর্টের সঙ্গে মোট দূরত্বের একটি স্কেচ তৈরীতে দুইধারে উল্লেখযোগ্য বস্তুর চিহ্ন বা নাম লিখে জমা দিতে হয়।

কম্পিউটার জ্ঞান

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ঃ

একটি কম্পিউটারকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যার হল সেই সব অংশ যা দৃশ্যত এবং ছোঁয়া যায়, যার কাঠামো আছে যেমন- মনিটর, মাউস, কেসিং, মাদরবোর্ড ইত্যাদি। কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরী হয় পারসোনাল কম্পিউটার। এরপর এতে অপারেটিং সিস্টেম ইন্সটল করা হয় এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়।

প্রক্রিয়াকরণের ধাপ অনুসরণ করে কম্পিউটারকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকে ইনপুট যন্ত্রাংশ বলে। যেমন- মাউস দিয়ে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেয়া হয়। তাই মাউস একটি ইনপুট যন্ত্র। এরকম আরো কিছু ইনপুট যন্ত্র হলো স্ক্যানার, কিবোর্ড, টাচ প্যাড, টাচ ক্রীন ইত্যাদি। এছাড়া, ছবি ও চলচ্চিত্রের জন্য ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েব ক্যাম, থ্রী-ডি স্ক্যানার, লেজার রেঞ্জফাইন্ডার; অডিও ইনপুটের জন্য মাইক্রোফোন, মিডি কিবোর্ড; খেলার জন্য জয়স্টিক, গেম প্যাড, গেম কন্ট্রোলার ইত্যাদি ইনপুট যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়।

প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশ- যে সকল যন্ত্রাংশ দিয়ে কম্পিউটার প্রদত্ত নির্দেশ প্রসেস বা প্রক্রিয়া করে তাকে প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশ বলে। যেমন মাউস দিয়ে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা মাউস পোর্টের মাধ্যমে মাদরবোর্ডে পৌছে এবং প্রসেস হয়। তাই মাদারবোর্ড একটি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র। আরো কিছু প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশ হলো- প্রসেসর, র‍্যাম (র‍্যানডম একসেস মেমোরি), রম (রিড ওনলি মেমোরি), ভিডিও কার্ড, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাংশ যেমন- মডেম, নেটওয়ার্ক কার্ড ইত্যাদি।

আউটপুট যন্ত্রাংশ– যেসকল যন্ত্রাংশ দিয়ে কম্পিউটারকে প্রদত্ত নির্দেশের ফলাফল দেখা যায় তাকে আউটপুট যন্ত্রাংশ বলে। যেমন মাউস দিয়ে কোন নির্দেশ দিলে তার ফলাফল কি হল তা মনিটরে দেখা যায়। তাই মনিটর একটি আউটপুট যন্ত্র। এরকম আরো কিছু আউটপুট যন্ত্রাংশ হলো– প্রিন্টার, স্পিকার, মনিটর, প্রজেক্টর।

সংরক্ষণ যন্ত্রাংশ– যে সকল যন্ত্রাংশ দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত তথ্য বা ফলাফল সংরক্ষণ করা হয় তাকে স্টোরেজ বা সংরক্ষণ অংশ বা যন্ত্রাংশ বলে। যেমন– সিডি রম। প্রক্রিয়াকৃত তথ্য সিডিরম দ্বারা খালি সিডিতে সংরক্ষণ করা যায়।

এরকম কিছু সংরক্ষণ যন্ত্রাংশ হলো– কম্পিউটার প্রাথমিক মেমোরি বা রম, সহায়ক মেমোরি যেমন– সিডি, ডিভিডি, ব্লু-রে, ফ্লপি ডিস্ক, পেনড্রাইভ, এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক, র‍্যাম, ম্যাগনেটিক টেপ, পাঞ্চ কার্ড ইত্যাদি। নিচের ছবিতে কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার ও সেগুলোর কার্যাবলী দেখানো হল ঃ

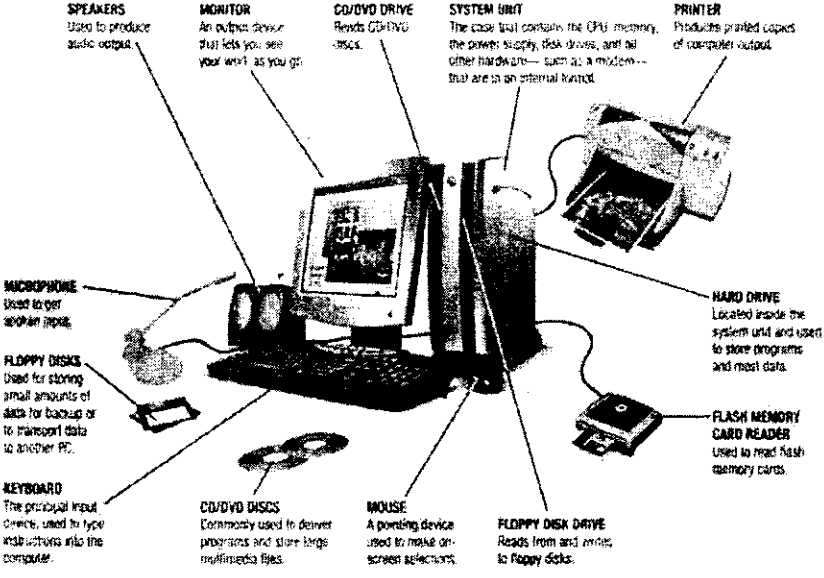

গান জানা

প্রত্যেক স্কাউটকে নির্দিষ্ট কতকগুলি গান জানতে হবে। গানের কথা মুখস্থ করতে হবে ও সঠিক সুরে গাইতে হবে। যেমন– জাতীয় সংগীত, প্রার্থনা সংগীত, স্কাউটের গান প্রভৃতি। আমরা জাতীয় সংগীত গাই। ট্রুপ মিটিং এ প্রার্থনা সংগীত গাই। এছাড়া বিভিন্ন সময় নিজেকে আরো সজীব ও আনন্দময় কাজের পরিবেশ তৈরি এবং অনুষ্ঠানে যোগদানে নির্দিষ্ট কিছু গান গাইতে হয়। যার কথা ও সুর জানা থাকলে সমস্বরে সবাই গাইতে পারা যায়। স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রোগ্রেজ ব্যাজে আরো তিনটি গান শিখতে হবে। ইতোপূর্বে তোমরা সদস্য ব্যাজে তিনটি এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজে চারটি গান শিখেছ। ঐ চারটি ছাড়া আরো তিনটি গান তোমাকে সঠিক কথা ও সুরে এবার শিখতে হবে।

তুমি এই গানগুলির কথা ও সুর সঠিকভাবে জানতে সিডি সংগ্রহ করতে পারো। যা স্কাউট শপে পাওয়া যাবে। নিচে তিনটি গানের কথা দেওয়া হল –

দেশের গান

ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা

ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রানে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥
ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা––
তবু জানিনে– যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে––
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

কথাঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রণ সংগীত

চল্ চল্ চল্

চল্ চল্ চল্
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুন প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

উষার দুয়াতে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত
আমরা টুটিব তিমির রাতে
বাঁধার বিন্ধ্যা চল॥

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজিব করিব মহা শ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল॥

চলরে নওজোয়ান
শোনরে পাতিযা কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ভাঙবে ভাঙ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ।

কথাঃ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

স্কাউট গান

জগতটাকে দু'হাত দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাই

জগতটাকে দু'হাত দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাই,
সমাজটাকে সবুজ ঘাসের মানুষ দিয়ে মুড়তে চাই,

বিভেদ কারো থাকবে না
হিংসা মনে রাখবে না

বন্ধু হবো আমরা সবাই, আনন্দে দেশ ভরতে চাই
গড়তে চাই, গড়তে চাই, সোনার এদেশ গড়তে চাই

দুঃখ ব্যথা রাখবোনা
মিথ্যে নিয়ে থাকবোনা

ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে সুখের জগত গড়েত চাই
গড়তে চাই, গড়তে চাই, সোনার মানুষ গড়তে চাই

কথাঃ মনযুর উল করীম/ইমরান নূর

ট্রুপ মিটিং

প্রোগ্রেস ব্যাজ অর্জন করতে হলে অন্ততঃ ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিং-এ তোমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে তুমি প্রোগ্রেস ব্যাজের প্রোগ্রামগুলি শিখতে ও চর্চা করতে পারবে। নিয়মিতভাবে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্ত থাকলে ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ তোমার জন্য খুবই সহজ ও নিয়মিত ব্যাপার। ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ 'মাই প্রোগ্রেস'-এ ইউনিট লিডার মূল্যায়ন করবেন; যা তোমার রেকর্ড হিসেবে থাকবে।

জাতীয় স্কাউট র‍্যালি

ক্রমিক নং	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	ক্যাম্পুরী চীফ
প্রথম	পুলেরহাট, যশোর	২৮ ফেব্রুয়ারি-০১ মার্চ,১৯৭৪	১১৫০ জন	জনাব পিয়ার আলী নাজির
দ্বিতীয়	রংপুর (জিলা স্কুল চত্বর)	২-৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭	২২০০ জন	জনব নূরুলিসলাম শামস
তৃতীয়	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	২-১১ এপ্রিল, ১৯৭৭	১০০০ জন	জনাব নূরুলিসলাম শামস্

নাম	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	জাম্বুরী চীফ
প্রথম জাতীয় জাম্বুরী	মৌচাক	২১-২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৮	৪,৪৬৪ জন	জনাব নূরুলিসলাম শামস
দ্বিতীয় জাতীয় ও ৫ম এপি জাম্বুরী	মৌচাক	৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮০ ৬ জানুয়ারি, ১৯৮১	৫,০১৭ জন	জনাব মনযূর উল করীম
তৃতীয় জাতীয় জাম্বুরী	মৌচাক	২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ ৪ জানুয়ারি, ১৯৮৬	৫,৩৬৯ জন	জনাব মনযূর উল করীম
চতুর্থ জাতীয় জাম্বুরী	মৌচাক	২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ৩ জানুয়ারি,১৯৯০	৬,৩৬৫ জন	জনাব মনযূর উল করীম
পঞ্চম জাতীয় ও ১৪ম এপি জাম্বুরী	মৌচাক	৫-১২ জানুয়ারি, ১৯৯৪	৭,৩৪৩ জন	জনাব মনযূর উল করীম
৬ষ্ঠ জাতীয় জাম্বুরী	মৌচাক	৫-১১ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯	১০,১১৮ জন	জনাব মনযূর উল করীম
৭ম জাতীয় ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরী	মৌচাক	৫-১২ জানুয়ারি ২০০৪	১৩,২০৭ জন	জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান
৮ম জাতীয় জাম্বুরী	মৌচাক	১৫-২২ জানুয়ারি ২০১০	১৫,০০০ জন	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
৯ম বাংলাদেশ ও প্রথম সানসো জাম্বুরী	মৌচাক	০৪-১১ এপ্রিল ২০১৪	১১,০০০ জন	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
১০ম বাংলাদেশ ও তৃতীয় সানসো জাম্বুরী	মৌচাক	০৮-১৪ মার্চ ২০১৯	১০,৮০৭ জন	ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

জাতীয় কমডেকা

নাম	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	কমডেকা চীফ
প্রথম	বাহাদুরপুর, গাজীপুর	০১-৫ নভেম্বর, ১৯৯২	২৫০ জন	জনাব আফজাল হোসেন (কমডেকা পরিচালক)
দ্বিতীয়	তামাতু, বরগুনা	১৮-২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৫	২,৬৮৭ জন	জনাব মনযুর উল করীম
তৃতীয়	সিরাজগঞ্জ	২৮ ডিসেম্বর, ২০০১ ৪ জানুয়ারি, ২০০২	৫,০৬৯ জন	জনাব মুহাঃ ফজলুর রহমান
চতুর্থ	কক্সবাজার	০৩-০৭ মার্চ-২০০৭	৩,৩১৯ জন	জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান
পঞ্চম	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়	২৯ জানুঃ- ০৪ ফেব্রুঃ-২০১৩	৬,১০৬ জন	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
ষষ্ঠ	হাইমচর চাঁদপুর	৩১ মার্চ -৫ এপ্রিল ২০১৮	৭,০০০ জন	ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

জাতীয় এ্যাগোনরী

নাম	স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	এ্যাগোনরী চীফ
প্রথম	কুমিলা জিলা স্কুল	১৩-১৬ ফেব্রু, ১৯৯০	১২৮ জন	জনাব মনযুর উল করীম
দ্বিতীয়	কুমিলা জিলা স্কুল	২২-২৬ ফেব্রু: ১৯৯৭	২৬০ জন	জনাব মনযুর উল করীম
তৃতীয়	মৌচাক, গাজীপুর	২৪-২৯ জানুয়ারি, ২০০১	৬০০ জন	জনাব মনযুর উল করীম
চতুর্থ	পুলেরহাট, যশোর	১৪-১৮ এপ্রিল, ২০০৫	৫৬১ জন	জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান
পঞ্চম	মৌচাক, গাজীপুর	১-৫ নভেম্বর, ২০১৩	১,২১১ জন	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

৬ষ্ঠ----------, চাঁদপুর